মযবুত ঈমান
সহীহ্ ইলম
নেক আমল

অধ্যাপক গোলাম আযম

মযবুত ঈমান
সহীহ ইল্‌ম
নেক আমল

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.amarboi.org

সাতাশতম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০২

মযবুত ঈমান সহীহ্ ইল্‌ম নেক আমল ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬, ❖ স্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ❖ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 40 6

www.amarboi.org

বইটির পটভূমি

আল্লাহর দীনকে বাস্তবে কায়েম করে সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ চালু করার জন্যই রাসূলগণের উপর কিতাব ও মীযান নাযিল করা হয়েছে বলে সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হবে বলে ঐ আয়াতে ইঙ্গিতও রয়েছে।

আল্লাহর দেওয়া বিধান শুধু তিলাওয়াত করলেই দীন আপনা-আপনি কায়েম হয়ে যাবে না। তাই দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব পালনের যোগ্য একদল মানুষকে গড়ে তুলবার জন্য রাসূলগণ চেষ্টা করেছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ১৩ বছর সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে একদল লোক তৈরি করেন। তৈরি করা এ লোকদের নিয়েই রাসূল (স) মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করেন এবং ১০ বছরের মধ্যে গোটা আরবে আল্লাহর দীন বিজয়ী হয়। ঐ রাষ্ট্রটি মানবজাতির ইতিহাসে চিরকালের জন্য একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে স্বীকৃত।

যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, তাদের প্রধান কর্তব্যই হলো ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজ নিজ দেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো। এ মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রথম কাজই হলো একদল লোক তৈরি করা।

লোক তৈরি করা বলতে কী বোঝায়? মানুষের মন, মগজ ও চরিত্র গড়াই হলো লোক তৈরির আসল কাজ। এ তিন দিক দিয়েই মানুষকে গড়ে তুলতে হয়। মনের সাথে ঈমান বা বিশ্বাসের সম্পর্ক। মগজের সাথে ইল্‌ম বা জ্ঞানের সম্পর্ক। আর চরিত্র মানে আমল বা কাজ। ভালো আমলে ভালো চরিত্র সৃষ্টি হয়, মন্দ আমলে মন্দ চরিত্র। তাই মন-মগজ-চরিত্র বললে ইসলামী পরিভাষায় ঈমান-ইল্‌ম-আমলই বোঝায়।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত তাদের মধ্যে বিশেষ করে ইসলামী ছাত্র শিবিরের বহু শিক্ষা শিবিরে এসব বিষয়ে আমি ২০০১ সাল থেকে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি। এসব আলোচনার মাধ্যমে ঈমান, ইল্‌ম ও আমল সম্পর্কে আমার মনে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে। এ তিনটি বিষয়ের নাম রেখেছি 'মযবুত ঈমান', 'সহীহ ইল্‌ম' ও 'নেক আমল'।

ইতঃপূর্বে এ তিনটি বিষয় দু'টি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ব্যাপক চাহিদাপূরণ ও সহজলভ্য করার লক্ষে বিষয়গুলো একই পুস্তিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনে সর্বস্তরের কর্মীদের মন-মগজ-চরিত্র গড়ে তুলতে এ পুস্তিকা সহায়ক হোক– এ কামনাই করছি।

আল্লাহ তাআলা আমার এ আশা পূরণ করুন। আমীন।

গোলাম আযম
মে ২০০৮

www.amarboi.org

সূচিপত্র

মযবুত ঈমান ৫-২৭ পৃষ্ঠা

মযবুত ঈমান ◆ ঈমান মানে কী? ◆ একটি বড় উদাহরণ ◆ বিশ্বাসের তিন অবস্থা ◆ বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক ◆ মানব জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী? ◆ না দেখে বিশ্বাস করি না ◆ জ্ঞান চর্চা বিশ্বাস দিয়েই শুরু হয় ◆ ইসলামে ঈমান সম্পর্কিত বিষয় কী কী? ◆ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বাস্তব রূপ কী? ◆ এসব সম্পর্কের স্বাভাবিক দাবি ◆ কীভাবে ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেয় ◆ মযবুত ঈমানের শর্ত কী কী? ◆ তাওহীদ ও শির্ক ◆ শির্ক চার প্রকার ◆ প্রচলিত শির্কের উদাহরণ ◆ তাগূতের অর্থ ◆ তাগূতের পরিচয় ◆ কালেমায়ে তাইয়েবা তাগূত বিরোধী ◆ একটি সহজ উদাহরণ ◆ তাগূতের সারকথা ◆ মযবুত ঈমানের সুফল

সহীহ ইল্‌ম ২৮-৪১ পৃষ্ঠা

ইল্‌ম মানে কী? ◆ জ্ঞান কোথা থেকে পাওয়া যায়? ◆ মানুষের কেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়? ◆ জ্ঞানই শক্তি ◆ অহীর জ্ঞানের শক্তি ◆ জ্ঞানের উৎস কী কী? ◆ এ জাতীয় জ্ঞানের কয়েকটি উদাহরণ ◆ সহীহ ইল্‌মের গুরুত্ব ◆ সহীহ ইল্‌মের উৎস ◆ কোন্ ইল্‌ম তালাশ করা ফরয? ◆ ইল্‌ম কতটুকু ফরয? ◆ মুমিনের দু'দফা ঘোষণা ◆ কতক উদাহরণ ◆ নফল ইল্‌মের মর্যাদা কী? ◆ পার্থিব অন্যান্য জ্ঞানের কোন শরয়ী মর্যাদা আছে কি? ◆ শখের বিদ্যার মর্যাদা কী?

নেক আমল ৪২-৪৮ পৃষ্ঠা

আমল মানে কী? ◆ নেক বলতে কী বুঝায়? ◆ কুরআনের পরিভাষায় ভালো ও মন্দ কাজ ◆ নাফস, রূহ ও কাল্‌বের ফাংশন বা কর্মতৎপরতা ◆ কর্ম সম্পাদনের কোন ক্ষমতা বা ইখতিয়ার মানুষের নেই ◆ সহীহ নিয়ত ছাড়া পুরস্কার পাওয়া যাবে না ◆ চেষ্টা না করা পর্যন্ত শুধু ইচ্ছা করার কোন ফল আছে কি? ◆ মৃত্যুর পরও কি আমল জারী থাকে? ◆ মন্দ কাজের বেলায়ও গুনাহ জারি থাকবে ◆ আমল সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মযবুত ঈমান

এ বিষয়টি সাতটি পয়েন্টে বিভক্ত করে আলোচনা করতে চাই।

১. ঈমান মানে কী? বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়? বিশ্বাসের সংজ্ঞা কী? বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী? কর্মের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক কী? বিশ্বাস কত রকম হতে পারে?
২. বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক।
৩. মানব জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী?
৪. ইসলামে ঈমান সম্পর্কিত বিষয় (ঈমানিয়াত) কী কী? কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হতে চাইলে তাকে কী কী বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে?
৫. আল্লাহর উপর ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে কেমন সম্পর্ক কায়েম হয়?
৬. ঈমান কী কারণে দুর্বল হয়? কোন্ পথে ঈমানে দুর্বলতা আসে?
৭. মযবুত ঈমানের শর্ত কী কী? কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ হলে ঈমান মযবুত হয়?

১. ঈমান মানে কী?

ঈমান আরবী শব্দ। এর সহজ অর্থ হলো বিশ্বাস। বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়? এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। ধরুন এক পরিচিত লোক এসে আমাকে বললেন, 'ভাই, আমাকে এক হাজার টাকা ধার দিন। আমি এক মাস পরই ফেরত দিয়ে যাব।'

এক মাস পর টাকাটা ফেরত দেবে কি না সে বিষয়ে আমার সরাসরি জানা নেই। আমি তাকে কী বলবো? তাকে তো আর একথা বলা যায় না যে, এক মাস পর ফেরত দেন কি না আগে দেখে নিই। তাহলে তাকে কী বলব? আমার কাছে লোকটি ধার চেয়েছে, হয় তাকে ধার দেব, আর না হয় ধার দিতে অস্বীকার করব। ধার দেব কি দেব না এ বিষয়ে কিভাবে আমি সিদ্ধান্ত নেব? টাকা সত্যি ফেরত দেবে কি না সে বিষয়ে ডাইরেক্ট নলেজ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান তো নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি তাকে যতটুকু জানি তাতে আমার মনে এ বিশ্বাস হয় কি না যে, লোকটি ওয়াদা পালন

www.amarboi.org

করবে। যদি তার উপর আমার বিশ্বাস হয় যে, এ লোক টাকা ফেরত দেবে তাহলে আমি তাকে ধার দেব। মোটকথা, ধার দেওয়ার এই সিদ্ধান্তটার ভিত্তিই হলো বিশ্বাস।

যদি তার অতীত আচরণ থেকে তার উপর আমার এ বিশ্বাস না হয় যে, টাকাটা ফেরত দেবে, তাহলে আমি ধার দেব না। আমি যে তাকে অবিশ্বাস করলাম, তাও পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে। তাকে ধার দিতে অস্বীকার করলে সে নিশ্চয়ই বলবে, 'আমাকে বিশ্বাস করেন না?' আমি যে তাকে অবিশ্বাস করলাম, এটাও কিন্তু বিশ্বাস। অর্থাৎ আমার বিশ্বাস যে, সে টাকা ফেরত দেবে না। তাকে আমি টাকা দিলামই না। কী করে জানলাম যে, সে টাকা ফেরত দেবে না? পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই আমি এ বিশ্বাসে পৌঁছেছি।

তাহলে বিশ্বাসের সংজ্ঞা কী দাঁড়াল? যে বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান নেই, অথচ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে; তখন পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় নেই; এভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়– তারই নাম বিশ্বাস।

একটি বড় উদাহরণ

মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে কি না এ বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান নেই। কিন্তু এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকারও উপায় নেই। যদি মৃত্যুর পর আরও একটি জীবন থাকে তাহলে আমাকে সে হিসাব মনে রেখেই দুনিয়ায় চলতে হবে। যদি না থাকে তাহলে বেপরোয়া চলা সহজ মনে হতে পারে। তাই এ বিষয়ে চুপ থাকার উপায় নেই। হয় আছে মনে করতে হবে আর না হয় নেই বলে ধারণা করতে হবে এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেব? কেউ ঐপার থেকে ফিরে আসে না। এপার থেকে উঁকি মেরে দেখাও সম্ভব নয়। পরকাল একেবারেই অদৃশ্য। পবিত্র কুরআনে অনেক সূরায় শুধু আখিরাতকে বিশ্বাস করার জন্য যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এসব জ্ঞানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানা যায় যে, পরকাল অবশ্যই আছে।

পরকাল সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান নেই, অথচ এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে। বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাই ঐ সিদ্ধান্ত পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। এভাবেই অদৃশ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্তটাই বিশ্বাস।

বিশ্বাসের তিন অবস্থা

যে দুটো উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এর ভিত্তিতে বিশ্বাসের তিনটি অবস্থা হলো ঃ

www.amarboi.org

১. ইতিবাচক বিশ্বাস

ক. আমার বিশ্বাস হয় যে, লোকটিকে ধার দিলে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে।

খ. আমার বিশ্বাস হয় যে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে।

২. নেতিবাচক বিশ্বাস

ক. আমার বিশ্বাস যে, লোকটি ধার নিলে টাকা ফেরত দেবে না।

খ. আমার বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই।

৩. সন্দেহ

ক. লোকটি টাকা ফেরত দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

খ. মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতেও পারে, নাও হতে পারে।

সন্দেহ মানে কোনো রকম বিশ্বাস এখনো জন্মেনি। ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো বিশ্বাস না হওয়াই সন্দেহ।

২. বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক

বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যে ধরনের বিশ্বাস হয়, সে অনুযায়ীই কর্ম হয়ে থাকে। বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম হয় না। বিশ্বাস তিন রকম হলেও কর্ম তিন রকম হয় না। ইতিবাচক বিশ্বাসের কর্ম এক রকম। আর নেতিবাচক বিশ্বাস ও সন্দেহের ভিত্তিতে কর্ম একই রকম হয়। যেমন ঃ যদি আমার বিশ্বাস হয় যে, লোকটি টাকা ফেরত দেবে তাহলে আমি তাকে টাকা ধার দেব।

যদি বিশ্বাস হয় যে, ফেরত দেবে না তাহলে আমি তাকে ধার দেব না। সন্দেহ হলেও ধার দেব না।

যে রকম বিশ্বাস হয় সে অনুযায়ীই কর্ম হয়। কর্মের পেছনে অবশ্যই বিশ্বাস রয়েছে। বিশ্বাস ছাড়া কর্ম হতে পারে না। বিশ্বাসের বিপরীতও কর্ম হয় না। বিশ্বাস ও কর্ম একেবারেই ঘনিষ্ঠ।

৩. মানব জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

সরাসরি জ্ঞানের উৎস হলো পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এ দ্বারা অতি সামান্য জ্ঞানই হাসিল করা যায়। শুধু এটুকু জ্ঞানের দ্বারা মানুষের জীবন চলে না। সামান্য কিছু ক্ষেত্র ছাড়া মানুষকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই চলতে হয়।

১. শৈশবে মা বলে দিয়েছেন যে, অমুক আমার বাবা। বিশ্বাস করেছি। এ বিষয়ে সরাসরি জ্ঞানের কোনো সুযোগ নেই।

www.amarboi.org

২. বাংলা ভাষা শিখার জন্য অ, আ, ক, খ'তে বিশ্বাস করেই এ ভাষা শিখতে হয়েছে।

৩. অসুখ হলে ডাক্তারের উপর বিশ্বাস না করলে চিকিৎসা পাওয়া অসম্ভব।

৪. ফসল হবে– এ কথা বিশ্বাস না হলে কৃষক চাষাবাদই করতে পারবে না।

৫. বিচারকের মনে সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে আসামি দোষী বলে বিশ্বাস সৃষ্টি হলেই শাস্তি দেয়, বিশ্বাস না হলে বা সন্দেহ হলে শাস্তি দেয় না।

৬. যে কোনো সময় মৃত্যু আসতে পারে। তবু মানুষ আরও বেঁচে থাকবে বিশ্বাস করে বলেই জীবন সচল আছে।

৭. মানুষে মানুষে সম্পর্ক বিশ্বাসের উপরই কায়েম থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, ভাই-ভাইয়ে সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক সবই বিশ্বাসনির্ভর।

হিসাব করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বাস ছাড়া একদিনও মানুষ চলতে পারে না। বিশ্বাসই গোটা জীবনকে ঘিরে রেখেছে।

না দেখে বিশ্বাস করি না

আজব মগজের এমন কিছু লোক আছে, যারা বহু বিষয়েই বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করে, কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের বেলায় বলে, 'না দেখে বিশ্বাস করি না।'

মযবুত ঈমান সম্পর্কে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সমাবেশে আলোচনাকালে 'না দেখে বিশ্বাস করি না'— কথাটার অসারতা প্রমাণ করার জন্য একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে থাকি। আমার হাতের মুঠোয় এক গুচ্ছ চাবি রেখে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলি, 'আমি দাবি করে বলছি যে, আমার হাতে এক গুচ্ছ চাবি আছে, তোমরা কি এ কথা বিশ্বাস কর?' ছেলেরা বলে, 'হ্যাঁ; বিশ্বাস করি।' আবার জিজ্ঞেস করি, 'কেন বিশ্বাস কর?' জবাবে বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি মিথ্যা বলেন না। তাই আপনি যখন বলছেন, চাবি আছে তখন আমরা এ কথা বিশ্বাস করি।'

মুষ্টি খুলে চাবিটি দেখিয়ে আবার জিজ্ঞেস করি, এটা চাবি তা বিশ্বাস কর? তখন কেউ কেউ বলে ফেলে, 'হ্যাঁ; বিশ্বাস করি।' আমি তখন বলি, যখন চাবিটি অদৃশ্য ছিল তখনই বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। চাবিটি দেখার পর বিশ্বাসের আর প্রয়োজন রইল না। যারা দেখার পরও বিশ্বাস করি বলেছ তারা বিশ্বাসের বাজে খরচ করেছ। দেখলে আর বিশ্বাসের দরকার হয় না। না দেখলেই বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

www.amarboi.org

তাই 'না দেখে বিশ্বাস করি না' কথাটি একেবারেই হাস্যকর ও অযৌক্তিক। বোকাদের পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব। কোনো নাস্তিকও তার মাকে এ কথা বলতে পারবে না, 'মা ছোট সময় না বুঝে তোমার কথা মেনে নিয়ে বিশ্বাস করেছি যে, অমুক আমার বাবা, এখন আমি না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না। তাই আমাকে দেখাও কেমন করে ঐ লোক আমার বাবা।' এ কথা না দেখেও বিশ্বাস করে। শুধু আল্লাহর বেলায় না দেখে সে বিশ্বাস করে না।

বাস্তব জীবনে বিশ্বাস ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য বিশ্বাসের আশ্রয় নিতে হয়। এ অবস্থায় আল্লাহ, ওহী, রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি বিরাট বিরাট বিষয়ে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

জ্ঞান চর্চা বিশ্বাস দিয়েই শুরু হয়

সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু আল্লাহই জানেন। هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ 'তিনিই শুরু, তিনিই শেষ'।

যে কোনো জ্ঞান চর্চা করতে হলে প্রথমেই কতক বিষয়কে বিশ্বাস করতে হয়।

A, B, C, D বা ا، ب، ت، ث –যেভাবে লেখা আছে এগুলোকে বিনা যুক্তিতে মেনে নিয়েই ভাষা শেখা শুরু করতে হয়। কেউ যদি তর্ক করে যে, এভাবে কেন, অন্যভাবে লিখলে দোষ কী? তাহলে তার ভাষা শেখা শুরু করাই সম্ভব হবে না।

জ্যামিতি পড়তে হলে প্রথমেই কতক Axiom বা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে বিশ্বাস করতে হয়। যেমন বিশ্বাস করতে হয় যে, বিন্দুর (Point) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কোনোটাই নেই; তবু বিন্দুর অস্তিত্ব আছে। যদিও পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী এটা একেবারেই অযৌক্তিক। তথাপি এটা বিশ্বাস না করলে জ্যামিতি শেখা শুরুই করা যায় না।

বিজ্ঞান চর্চা প্রথমে হাইপথেসিস (কল্পনা, অনুমান) দিয়েই শুরু হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক নিউটন সম্পর্কে জানা যায় যে, ফলের বাগানে বসা অবস্থায় তাঁর সামনে গাছ থেকে একটা আপেল নিচে পড়লো। এর আগেতো বহুবার তিনি আপেল পড়তে দেখেছেন; কিন্তু সেদিন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো যে, উপরেও শূন্য নিচেও শূন্য। তাহলে ফলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে নামল কেন? তাঁর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো শক্তি আছে, যা বস্তুকে আকর্ষণ করে। এভাবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা হয়।

www.amarboi.org

জ্ঞানের ময়দানে কোনো বিষয়েই জ্ঞানের শুরু বা শেষ মানুষের আয়ত্তে নেই। প্রথমে বিশ্বাস দিয়ে জ্ঞান চর্চা শুরু হয় এবং একটি পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে চর্চা থেমে যায়। জ্ঞানের শেষ পর্যন্ত পৌঁছার সাধ্য মানুষের নেই।

৪. ইসলামে ঈমান সম্পর্কিত বিষয় কী কী?

ইসলাম গ্রহণ করতে হলে বা মুসলিম হতে হলে ৭টি বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে। ইসলামে ঈমান বলতে এ সাতটি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায়। এগুলোকে ঈমানে মুফাস্‌সাল তথা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়। আরবীতে এগুলোকে শিখতে হয়–

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

'আমি ঈমান আনলাম– আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিন (পরকাল), তাকদীরের ভালো ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন-এর প্রতি।'

ঈমানের প্রধান বিষয় তিনটি– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। ঐ ৭টি বিষয় এ তিনটিরই অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদের মধ্যে শামিল রয়েছে তিনটি– আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও তাকদীর। রিসালাতের মধ্যে দুটি– কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ। আর আখিরাতের মধ্যে দুটি– শেষ দিন ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন।

তাওহীদের মধ্যে আল্লাহর সাথে ফেরেশতাকে এ জন্যই শামিল করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করা হত। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহর দাস ও কর্মচারী মাত্র। তারা আল্লাহর কোনো ক্ষমতায় সামান্যতম শরীকও নয়। তাদের সম্পর্কে এ ধারণা থাকলে আল্লাহর সাথে কোনো দিক দিয়েই তাদেরকে শরীক করার আশঙ্কা থাকে না।

তাকদীর মানে সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত তিনি করেন, সেটাই তাকদীর। মানুষের জীবনে ভালো ও মন্দ যা-ই ঘটে তা আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ঘটে থাকে। সেখানে অন্য কোনো শক্তির হাত নেই। আল্লাহর এই একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব তাওহীদেরই অন্তর্ভুক্ত।

www.amarboi.org

৫. আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বাস্তব রূপ কী?

আল্লাহর উপর ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে বান্দাহর বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্ককে সূরা নাস-এ তিনভাবে প্রকাশ করেছেন।

১. رَبِّ النَّاسِ 'মানুষের রব বা প্রতিপালক।' যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ইত্যাদি। আর মানুষ তাঁর দয়ার ভিখারি, তাঁর একান্ত অনুগৃহীত ও প্রতিপালিত।

২. مَلِكِ النَّاسِ 'মানুষের বাদশাহ।' তিনি রাজা, আর মানুষ তাঁর প্রজা। কোনো অবস্থায়ই কারো পক্ষে তাঁর রাজত্বের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। তাঁর রাজ্যের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানে মানুষ আবদ্ধ। ভালো বা মন্দ কিছু করার ইচ্ছা ও চেষ্টার ইখ্‌তিয়ারটুকু শুধু মানুষকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ সমাধা করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কর্ম সমাধা করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টা করা হলেই মানুষ কর্মের পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। কর্ম সম্পন্ন না হলেও এর বদলা পাবে। ইচ্ছা ও চেষ্টার সামান্য ইখতিয়ারটুকু ছাড়া আল্লাহ তাঁর প্রজাকে আর কোনো ক্ষমতাই দেননি।

৩. اِلٰهِ النَّاسِ 'আল্লাহই মানুষের একমাত্র ইলাহ, মাবুদ, হুকুমকর্তা, প্রভু ও মুনিব।' তাঁর হুকুমের বিরোধী কোনো হুকুম মানার অধিকার মানুষের নেই।

রাসূল (স) বলেন– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'স্রষ্টাকে অমান্য করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য চলে না।'

এসব সম্পর্কের স্বাভাবিক দাবি

যে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর উপর ঈমান আনে তার ঈমানের দাবি সে পূরণ করতে সক্ষম হয়।

১. সে আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মেনে নেয়। যা কিছু সে দুনিয়ায় ভোগ করে এর জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর প্রতিই জ্ঞাপন করে। তার দেহে যত নিয়ামত আছে, তার অন্তরে যত সুকামনা আসে, তার মনে যত সুচিন্তা আসে, নেক কাজের যত ইচ্ছা মনে জাগে, সৎকাজের জন্য চেষ্টা করার যতটুকু তাওফীক হয়, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের যা কিছু ব্যবহার করা ও ভোগ করার সুযোগ সে পায়–এ সকল বিষয়েই সে একমাত্র আল্লাহর নিকট

www.amarboi.org

শুকরিয়া জানায়। একমাত্র তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে এবং মনে তাঁরই অনুগ্রহের তৃপ্তি বোধ করে। প্রতিটি নিঃশ্বাসই তাঁর দয়া বলে অনুভব করে। প্রতিটি আপদ-বিপদকে তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে। সে আল্লাহকেই একমাত্র রিয্কদাতা ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে। কঠিন মুসীবতেও সে পেরেশান হয় না। কোনো অবস্থায়ই তাঁর রব থেকে নিরাশ হয় না। সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ রেখেছেন বলে বিশ্বাস করে। একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করে মনে সান্ত্বনা বোধ করে।

২. সে আল্লাহকে একমাত্র বাদশাহ মনে করে এবং আর কোনো শক্তির পরওয়া সে করে না। কোনো বড় শক্তিই তার নিকট বড় নয়। যিনি সকল বাদশাহর বাদশাহ, সে নিজেকে তাঁরই স্নেহভাজন প্রজা মনে করে। কারো দাপটে সে ভীত হয় না। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তিকে ভয় করার সামান্য প্রয়োজনও সে বোধ করে না। কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে সে মনে করে না। সে পরম সাহসী ও চরম নির্ভীক। দুনিয়া ও আখিরাতে সে আল্লাহকেই একমাত্র ওলী বা স্নেহপরায়ণ অভিভাবক মনে করে। সর্বাবস্থায় সে অন্তরে প্রশান্তি বোধ করে। কোনো অবস্থায়ই বিচলিত হওয়া প্রয়োজন মনে করে না। নিজেকে সে আল্লাহর সৈনিক মনে করে এবং তাঁর বাদশাহর রাজত্ব কায়েম করা ও কায়েম রাখা সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে করে। আল্লাহর অপছন্দনীয় সবকিছু উৎখাত করার জযবা রাখে। সে আল্লাহ তাআলাকেই আর সব কিছু থেকে বেশি ভালোবাসে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেয়ে বড় কোনো আকাঙ্ক্ষা তার থাকে না। মালিকের সন্তুষ্টির জন্য জান কুরবান করার মধ্যেই সে গৌরব বোধ করে। শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের লক্ষ্যে জান ও মাল কুরবান করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করাই জান্নাত লাভের সোপান মনে করে।

৩. আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বলে বিশ্বাস করে। তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম পালন করতে সে এক বিন্দুও প্রস্তুত নয়। তাঁর আদেশ পালন করা ও তাঁর নিষেধ থেকে নিজেকে বিরত রাখাই তার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যের একমাত্র উপায় বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ বলে সে মনে করে। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য আর কোনো বিকল্প উপায় আছে বলে সে বিশ্বাস করে না।

www.amarboi.org

৬. কীভাবে ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেয়?

আল্লাহ তাআলার প্রতি সত্যিকার ঈমান থাকলে তাঁর সাথে যেসব সম্পর্ক গড়ে উঠে, এ সম্পর্কের দাবি পূরণ করাই মুমিনের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের দাবি পূরণে সে-ই ব্যর্থ হয়, যার ঈমান দুর্বল। তাই প্রত্যেক মুমিনেরই এ বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন যে, কোন্ পথে ঈমানে দুর্বলতা আসে। যখনই ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেবে তখনই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এটা বিরাট কথা। এ বিষয়ে চরম সতর্কতা প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় বহু কিছুর সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক গড়েছেন। সেসব সম্পর্ক ত্যাগ করার অনুমতিও তিনি দেননি। বরং এসব সম্পর্ককে তিনি সজ্জা বলে ঘোষণা করেছেন।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ـ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

'মানুষের জন্য তাদের পছন্দসই জিনিস নারী, সন্তান, সোনা-রুপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, পালিত পশু ও চাষের জমি খুবই কামনার বিষয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব দুনিয়ার ক'দিনের জীবিকা মাত্র। আসলে যা ভালো আশ্রয়, তা তো আল্লাহর কাছেই আছে।' (সূরা আলে ইমরান : ১৪)

এসব ভালোবাসার বিষয় দ্বারা মানুষের জীবনকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করলেন। এসব ভালোবাসার সজ্জাকে ত্যাগ করে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আল্লাহর নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হবে। দুনিয়ায় যেসব জিনিসের সাথে আল্লাহ নিজে এ ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, এসব ভালোবাসার পরিমাণও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। ঐ পরিমাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসলেই ঈমান দুর্বল হয়। আল্লাহ বলেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

www.amarboi.org

'(হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতামাতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, ঐ মাল যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের ঐ কারবার তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ বাড়ি যা তোমরা পছন্দ কর—(এসব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসিকদেরকে হেদায়াত করেন না।' (সূরা তাওবা : ২৪)

এ আয়াতে অতি স্পষ্ট ভাষায় দুনিয়ার ভালোবাসার জিনিসগুলোকে কী পরিমাণ ভালোবাসা যাবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসলেই ঈমান দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে। যখন ঐ আটটি জিনিসের ভালোবাসা এ তিনটির চেয়ে বেশি হবে তখনি ঈমানের বিপদ। আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদের ভালোবাসার সাথে ঐ ৮টি জিনিসের ভালোবাসার যখনি টক্কর হবে, তখন তিনটির ভালোবাসা অধিক বলে প্রমাণ দিতে পারলে ঈমান নিরাপদ থাকবে। ঐ আটটির ভালোবাসা নিষিদ্ধ নয়; বরং কর্তব্য। কিন্তু তিনটির চেয়ে ঐ ৮টির ভালোবাসা বেশি হলেই প্রমাণিত হবে যে, ঈমান দুর্বল।

একটি চমৎকার উদাহরণ এ কথাটিকে সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে দেয়। পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না বলেই এ কথাটি বলা হয়। কিন্তু মানুষ কি পানিতে ডুবে মরে না? তাহলে পানিকে জীবন বলা যায় কী করে? আসল কথা হলো, এক বিশেষ পরিমাণ পানি অবশ্যই জীবন। এ পরিমাণের বেশি হলে পানিই মরণ।

তেমনিভাবে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে ঐ আটটি জিনিসের ভালোবাসা কম হলে এটাই ঈমানের জীবন। আর ৩টি থেকে ৮টির ভালোবাসা বেশি হলেই ঈমানের মরণ।

আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি দায়িত্ব পালনের পথে যখন ঐ আটটি ভালোবাসার বস্তু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন ঐ দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি হয়। এ বাধা দূর করতে পারলে, অর্থাৎ তিনটির ভালোবাসার খাতিরে যদি আটটির ভালোবাসা কুরবানী দেওয়া যায়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, ঈমান দুর্বল নয়। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ তখন আর ঈমানের দাবি পূরণ করার শক্তি থাকে না।

সম্পদ ও সন্তানকে আল্লাহ সজ্জাও বলেছেন, ফিতনাহও বলেছেন–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

'মাল ও সন্তানাদি দুনিয়ার জীবনের সজ্জা।' (সূরা কাহ্‌ফ : ৪৬)

www.amarboi.org

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ـ

'নিশ্চয়ই তোমাদের মাল ও সন্তান ফিতনা' (সূরা তাগাবুন : ১৫)

ঐ আটটি ও তিনটির ভালোবাসায় যদি ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান জীবনের সজ্জা। আর যদি আটটির ভালোবাসা বেশি হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান ফিতনা। ইসলামী পরিভাষায়, আল্লাহর হুকুম পালনে বাধাকেই ফিতনা বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থ– পরীক্ষা, বিপদ, গোলযোগ, আকর্ষণ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি।

সূরা মুনাফিকূনের দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

'হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ শোন! তোমাদের মাল ও আওলাদ (সম্পদ ও সন্তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে না দেয়।' এসবের ভালোবাসায় এমন মগ্ন হয়ে যেয়ো না, যার কারণে ঈমানের দাবি পূরণে অবহেলা হয়ে যায়।

৭. মযবুত ঈমানের শর্ত কী কী?

মযবুত ঈমানের প্রধান শর্ত দুটো ঃ

১. শির্কমুক্ত ঈমান বা নির্ভেজাল তাওহীদ।

২. ঈমানের দাবিদারকে তাগূতের কাফির হতে হবে।

সুতরাং মযবুত ঈমানের অধিকারীকে তাওহীদ, শির্ক ও তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হবে।

তাওহীদ ও শির্ক

তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিভাষা হলো শির্ক। তাওহীদ শব্দের অর্থ হলো অদ্বিতীয়তাবাদ। সাধারণত এর অর্থ করা হয় একত্ববাদ। এ অর্থটি ত্রুটিপূর্ণ। আরবী ওয়াহিদ শব্দের অর্থ এক, আর আহাদ অর্থ অদ্বিতীয়। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ —বল যে, আল্লাহ অদ্বিতীয়। একের পর দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা রয়েছে। তাই একত্ববাদ বললে মূল মর্মটি বুঝায় না। অদ্বিতীয় মানে, যার কোনো সমকক্ষ নেই, এমনকি যার সাথে তুলনা করার মতোও কেউ নেই।

তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে শির্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ তাওহীদ মানেই শির্ক না থাকা। তাওহীদের সবচেয়ে স্পষ্ট ও

www.amarboi.org

সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাই হলো শির্কমুক্ত ঈমান। যেমন আলোর সহজ সংজ্ঞা হলো, অন্ধকার না থাকা। তাই শির্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তারা কাফির। যারা শির্ক করে, তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে না। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু আল্লাহর সাথে অন্যান্য সত্তা বা শক্তিকে বিভিন্নভাবে শরীক করে। তাদেরকে মুশরিক বলা হয়।

শির্ক শব্দটির অর্থ হলো শরীক করা। আল্লাহর সাথে কী কী ভাবে শরীক করা হয় তা বুঝতে পারলে শির্ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এবং শির্ক থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হবে।

মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে সূরা আনআমের ১২৮নং টীকায় শির্ক সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন এর সমমানের কোনো আলোচনা আমি পাইনি। কুরআন মাজীদে শত শত আয়াতে শিরকের কথা আছে এবং ঐসব জায়গায়ই টীকাও আছে। আমার জানা মতে, সূরা আনআমের ১২৮নং টীকাতে শির্কের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অন্যান্য শত শত টীকায় কোথাও ১০% কোথাও ৫০% ব্যাখ্যা আছে। ১২৮ নং টীকাটি ভালোভাবে হজম করতে পারলে অন্যান্য টীকা পড়ার দরকারই হবে না। আমি সে ব্যাখ্যাটিই এখানে পেশ করছি।

শির্ক চার প্রকার

যারা আল্লাহর সাথে অন্য সত্তাকে শরীক করে তারা এ কাজটি চারভাবে করে থাকে।

১. شِرْكٌ فِى الذَّاتِ —আল্লাহর সত্তার (Person) সাথে শরীক করে।

যেমন কাউকে আল্লাহর পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী সাব্যস্ত করে। কুরআনে আছে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ .

'ইহুদীরা হযরত ওযায়িরকে আল্লাহর পুত্র বলে। আর খ্রিস্টানরা মাসীহ (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে।' (সূরা তাওবা : ৩০)

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর মা হযরত মারইয়াম (আ)-কে আল্লাহর স্ত্রী মনে করে।

ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা মনে করা হত বলে কুরআনে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। দেব-দেবীদেরকেও আল্লাহর বংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। কতক

www.amarboi.org

স্বৈরশাসক নিজেদেরকে স্রষ্টার বংশধর বলে দাবি করেছে। এভাবেই আল্লাহর যাতের সাথে অন্য সত্তাকে শরীক করা হয়।

২. شِرْكٌ فِى الصِّفَاتِ —আল্লাহর গুণাবলির সাথে শরীক করা।

যেসব গুণ একান্তই আল্লাহর সেসব গুণ কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক। যেমন– গায়েবী ইলম বা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান। কারো সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনি সবকিছু জানেন, দেখেন বা শুনেন এবং সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

৩. شِرْكٌ فِى الْاِخْتِيَارَاتِ —আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করা।

যেসব ক্ষমতা শুধু আল্লাহর সেসব ক্ষমতা আর কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক। যেমন–

ক. আইন দেওয়ার ক্ষমতা, হালাল ও হারাম বা জায়েয ও না জায়েয-এর সীমা নির্ধারণ করা। মানবজীবনের জন্য বিধি-বিধান রচনা করা একমাত্র আল্লাহর ইখ্তিয়ার। আল্লাহর দেওয়া আইনের অধীনে মানুষেরও আইন রচনার ক্ষমতা আছে; কিন্তু মৌলিক আইন রচনার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

খ. অলৌকিকভাবে কারো উপকার বা ক্ষতি করা, প্রয়োজন পূরণ করা, হেফাযত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, দোআ শোনা ও কবুল করা, ভাগ্য গড়া ও ভাঙা ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে করার ক্ষমতা আছে মনে করা।

গ. সন্তান দান করা, রোগ দেওয়া ও আরোগ্য করা, রিয্ক দান, আপদ-বিপদ দেওয়া ও দূর করা ইত্যাদি শুধু আল্লাহর একক ক্ষমতা। এতে কেউ শরীক নেই।

৪. شِرْكٌ فِى الْحُقُوْقِ —আল্লাহর অধিকারে আর কাউকে শরীক করা।

যেমন– রুকু ও সিজদা করা, হাত বেঁধে নত হয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো, পশু কুরবানী করা, বিপদ-আপদে কাতরভাবে দোআ করা, দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় কোনো কিছু দান করা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বা হক।

প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কারো অসন্তুষ্টির ভয় করা, প্রয়োজন পূরণের ও বিপদ দূর করার জন্য দোআ করা, নিঃশর্ত আনুগত্য করা, সত্য ও অসত্যের মাপকাঠি গণ্য করা ইত্যাদি শুধু আল্লাহর হক। এসব হকের কোনোটি পাওয়ার যোগ্যতা অন্য কোনো সত্তার আছে বলে মনে করা শির্ক।

www.amarboi.org

কুরআন মাজীদে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না। উপর্যুক্ত ৪ প্রকার শিরকের ১নং শির্ক মুসলমানদের মধ্যে নেই। কিন্তু বাকি সব রকমের শির্কই মুসলমানদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ হলো, শির্ক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা।

প্রচলিত শির্কের উদাহরণ

১. আমাদের দেশে মানুষের মনগড়া আইন চালু আছে। আল্লাহর আইন কায়েমের চেষ্টা না করলে বুঝা গেল যে, মানুষের তৈরি চালু আইনকে মন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব আইন বৈধ মনে করা যে শির্ক তা অনেকেই বুঝে না। যারা এসব অবৈধ আইন উৎখাত করে আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করে, তারা শির্ক থেকে বেঁচে গেল।

২. রিয্কের মালিক একমাত্র আল্লাহ। যে পেশাই গ্রহণ করা হোক, ঐ পেশা রায্যাক নয়। ঐ পেশা নষ্ট হলেও আল্লাহ অন্য উপায়ে রিয্ক দিতে সক্ষম।

কোনো স্কুল, কলেজ বা মাদরাসার শিক্ষক ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। ঐসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিয্ক বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে দীনের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি কেউ চাকরি চলে যাবার ভয়ে ইকামাতে দীনের কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে বুঝা গেল যে, সে আল্লাহকে একমাত্র রায্যাক মনে করে না। সে চাকরিকেও রিয্কদাতা হিসেবে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে। এভাবেই শির্ক ঈমানকে দুর্বল করে। ঈমান শির্কমুক্ত না হলে মযবুত হতে পারে না। যে চাকরি বাঁচানোর জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করা বন্ধ করল, আল্লাহর সাথে তার ঈমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

কয়েক বছর আগে খুলনা থেকে এক যুবক আলেম আমার সাথে দেখা করলেন। বললেন, আমি খুলনায় এক মসজিদের ইমাম ছিলাম। আমি প্রকাশ্যে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। মসজিদ কমিটিতে চরমোনাইর পীরের মুরীদদের সংখ্যাই বেশি। তারা আমাকে জানালেন যে, জামায়াতে ইসলামী ত্যাগ না করলে আমাকে ইমামতী ত্যাগ করতে হবে। আমি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি । কারণ আমি বুঝে-শুনে জামায়াতে কাজ করছিলাম।

যদি তিনি চাকরিতে বহাল থাকার জন্য জামায়াত ত্যাগ করতেন তাহলে এটা শির্ক হতো এবং আল্লাহর সাথে তাঁর ঈমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। তিনি শির্ক থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই সাহস করে চাকরি ছেড়ে দিলেন।

এর বিপরীত উদাহরণই বেশি পাওয়া যায়। কুমিল্লা জেলার এক দাখিল মাদরাসার দু'জন তরুণ শিক্ষক আমার সাথে দেখা করতে এলো। পরিচয় দিতে

www.amarboi.org

গিয়ে বলল, আমরা দু'জনই ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা যেখানে শিক্ষকতা করছ ওখানে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন নেই? জওয়াবে বলল, অবশ্যই আছে। বললাম, তাহলে জামায়াতের সাথে কী সম্পর্ক তা তো বললে না। বলল, মাদরাসার সুপার এত জামায়াতবিরোধী যে, আমরা জামায়াত করছি জানলে মাদ্‌রাসা থেকে বের করে দেবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি আল্লাহকে রায্‌যাক মনে কর না? বিস্মিত হয়ে এ কথা কেন বললাম তা জানতে চাইল। বললাম, তোমরা ঐ মাদরাসাকেও রিয্‌কদাতা মনে করছ– এটা শির্‌ক। এ কারণেই এ দুর্বলতা প্রদর্শন করছ এবং চাকরি বাঁচানোর জন্য দীনের দায়িত্বে অবহেলা করছ। এতে ঈমানের দুর্বলতাই প্রকাশ পেল। এতে আল্লাহর সাথে ঈমানী সম্পর্কটাই ছিন্ন হয়ে গেল কি না তোমরা ভেবে দেখ।

৩. আমাদের দেশে অনেক লোক আজমীরে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (র) এবং বাগদাদে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর মাযারে গিয়ে তাঁদের নিকট সন্তানের জন্য, বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, রোগ দূর করে দেওয়ার জন্য এবং আরও বিভিন্ন রকম মকসূদ হাসিলের উদ্দেশ্যে দোআ করে। এসব দোআ শুধু আল্লাহর দরবারেই করা প্রয়োজন। বুজুর্গদের মাযারে গিয়ে দোআ করা সুস্পষ্ট শির্‌ক। ওখানে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোআ করাও সঠিক নয়। আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য সেখানে যাওয়া অর্থহীন।

মাযার ও কবরের সাথে সম্পর্কিত বহু রকমের শির্‌ক ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে চালু রয়েছে।

তাগূতের অর্থ

তাগূত শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহ তাআলা আয়াতুল কুরসীতে তাঁর সার্বভৌম গুণাবলি উল্লেখ করে তারপর বলেন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ـ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

'অতএব যে কেউ তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে এমন মযবুত রশি ধরেছে যা কখনও ছিঁড়বে না। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।' (সূরা বাকারা : ২৫৬)

www.amarboi.org

আল্লাহ তাআলার গুণাবলি উল্লেখ করে এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়েছে, কেউ যদি উপর্যুক্ত গুণাবলিসম্পন্ন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে তাগূতের কাফির হতে হবে। তাগূতের কাফির না হয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে তাগূতের চাপে ও দাপটে সে ঈমানের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাগূতের চাপে ঐ সম্পর্ক বহাল থাকে না। তাগূতকে মানতে অস্বীকার করলে অর্থাৎ তাগূতের চাপকে অগ্রাহ্য করার হিম্মত করলে আল্লাহর সাথে ঈমানের সম্পর্ক এমন মযবুত হয় যে, তা আর ছিন্ন হয় না। আয়াতে ঈমানের এ সম্পর্কটিকে রশি বা রজ্জুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এ কারণেই মযবুত ঈমানের শর্ত হিসেবে তাগূতকে মানতে অস্বীকার করতে হবে বা তাগূতের কাফির হতে হবে। তাই তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন বা তাগূতকে ঠিকমত চিনে নেওয়া দরকার।

তাগূত সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের টীকা পড়েও মনে তৃপ্তি বোধ না করায় সরাসরি মাওলানা মওদূদীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি যা বললেন, তা নিম্নরূপ ঃ

'আল্লাহ তাআলা তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য যেমন বাধ্য করেননি, অমান্য করতেও বাধ্য করেননি। মানা ও না মানার ইখ্‌তিয়ার মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহর নাফরমানীর দুটো সীমা রয়েছে। প্রাথমিক সীমা হলো فِسْقٌ (ফিস্‌ক) আর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে كُفْرٌ (কুফর)। যে আল্লাহর হুকুম স্বীকার করে বটে, কিন্তু পালন করে না, সে ফাসিক। আর যে হুকুমকে স্বীকারই করে না, সে কাফির। যে নাফরমানীর এ দুটো সীমা লঙ্ঘন করে সেই তাগূত।'

ব্যক্তিগতভাবে কেউ ফাসিক বা কেউ কাফির হতে পারে। এটা যার যার ইখতিয়ার বা স্বাধীন ইচ্ছা। আল্লাহর নাফরমানীর এ দুটো সীমা রয়েছে। যে এ সীমাও লঙ্ঘন করে সে হলো তাগূত (طَاغُوْت)। এ দুটো সীমা লঙ্ঘন করার মানে কী? কেমন করে এ সীমা লঙ্ঘন করা হয়? এটা বুঝলেই তাগূতকে চেনা সহজ হবে।

যে নিজে ফাসিক এবং অন্য মানুষকেও ফাসিক বানানোর চেষ্টা করে সেই তাগূত। সে নাফরমানীর প্রাথমিক সীমা লঙ্ঘন করলো। যে নিজে কাফির এবং অন্যকেও কাফির বানানোর চেষ্টা করে সেই তাগূত। সে আল্লাহর নাফরমানীর শেষ সীমাও লঙ্ঘন করলো।

www.amarboi.org

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বোঝার আছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে নিজস্ব সত্তা দিয়ে আলাদাভাবে পয়দা করেন। সে দুনিয়ায় আসার সময় যেমন একা আসে, যাওয়ার সময়ও একাই যায়। আখিরাতে তাকে তার কৃতকর্মের ফল আলাদাভাবেই দেওয়া হবে।

তার শাস্তি সে একাই ভোগ করবে। তার পুরস্কারও সে একাই পাবে। তার কর্মের জন্য সে-ই দায়ী হবে। তাই তাকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ইখ্‌তিয়ার এককভাবেই দেওয়া হয়েছে। অন্য মানুষকে আল্লাহর নাফরমান বানানোর কোনো ইখ্‌তিয়ার কাউকে দেওয়া হয়নি। যারা নিজে নাফরমান এবং অন্যকেও নাফরমান বানাতে চেষ্টা করে, তারাই আল্লাহর দেওয়া নাফরমানীর সীমা লঙ্ঘন করে– এরাই তাগূত।

তাগূতের পরিচয়

তাগূতকে মানতে অস্বীকার করতে হলে কে কে তাগূত তা জানতে হবে। কুরআনে তালাশ করলে ৫ প্রকার তাগূত পাওয়া যায়।

১. নাফস ও হাওয়া (اَلنَّفْسُ وَ الْهَوٰى) নাফস মানে প্রবৃত্তি, আর হাওয়া মানে কুপ্রবৃত্তি। দেহের যাবতীয় দাবিকে একসাথে নাফস বলা হয়। যে দাবি মন্দ তাকেই হাওয়া বলে।

দেহের ভালো ও মন্দের কোনো ধারণা নেই। এ ধারণা আছে বিবেকের। রূহের সিদ্ধান্তই বিবেক। নাফস বা দেহের দাবি মন্দ বলেই ধরে নিতে হবে। বিবেক যাচাই করে বলে দেয় কোন দাবিটা ভালো বা মন্দ। সূরা ইউসূফের ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ—নিশ্চয়ই নাফস মন্দেরই হুকুম দেয়। আল্লাহর নাফরমানীর জন্য তাগিদ দেয় বলেই নাফস তাগূত।

যদি কেউ সত্যিই আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই নাফসের কাফির হতে হবে। কেউ যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে চায় তাহলে প্রথমেই তাকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, 'আমি নাফসের কথা মেনে চলব না-না-না।' অর্থাৎ আমি বিবেকের বিরুদ্ধে চলব না-না-না।

এ সিদ্ধান্ত না নিলে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও নাফসের গোলামই থেকে যাবে। সে আল্লাহকে ইলাহ বা হুকুমকর্তা স্বীকার করা সত্ত্বেও নাফস বা হাওয়াকে ইলাহ হিসেবেই মেনে চলবে।

সূরা ফুরকানের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

www.amarboi.org

সূরা জাছিয়ার ২৩ নং আয়াতে আছে, اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ অর্থ : তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার কুপ্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে?

কুরআনের অনুবাদে অনেকেই তাগূত অর্থ লিখেছেন শয়তান। শয়তান আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য উসকে দেয় বলে শয়তান অবশ্যই তাগূত। কিন্তু তাগূত অর্থ শয়তান নয়। যারা তাগূতের অর্থ শয়তান লিখেছেন, তারা তাগূতের সঠিক পরিচয় জানেন না।

আমি শয়তানকে পৃথকভাবে তাগূত গণ্য করি না। কারণ শয়তান মানুষের নাফসকে বিভ্রান্ত করেই নাফরমানীর জন্য ওয়াসওয়াসা দেয়। তাই প্রথম নম্বর তাগূতের মধ্যেই শয়তান অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে নাফস ও শয়তানকে একই সাথে তালিকার ১ নম্বরে রাখা যায়।

২. শরীআতবিরোধী প্রচলিত কুপ্রথা ও সামাজিক কুসংস্কারও তাগূত (Customs and traditions)। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ـ

'যখন তাদেরকে বলা হলো যে, আল্লাহ যা (ওহীযোগে) নাযিল করেছেন তা মেনে চল, তখন তারা বলল, আমাদের বাপ-দাদাকে যা মেনে চলতে দেখেছি, আমরা তাই মেনে চলব।' (সূরা বাকারা : ১৭০)

সমাজে বহু কুপ্রথা প্রচলিত আছে যা শরীআতবিরোধী। ধর্মের নামেও বহু শরীআতবিরোধী প্রথা চালু আছে। বিয়ে-শাদিতে তো কুপ্রথার ব্যাপক প্রচলন আছে। কুপ্রথাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। এসবকে অমান্য করতে গেলে বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কুপ্রথাগুলো আইনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। আইন চালু করতে হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (Law Enforcing Agency) প্রয়োজন হয়। কুপ্রথা নিজের শক্তি বলেই চালু থাকে। আইন করেও তা দূর করা সহজ নয়।

এ কারণেই সামাজিক কুসংস্কারগুলোও তাগূত। এসবকে মানতে অস্বীকার না করলে ঈমানের দাবি পূরণ করা যায় না। এগুলো আল্লাহর হুকুমের বিরোধী। এসবকে মেনে চললে আল্লাহকে অমান্য করা হয়।

৩. শাসন-শক্তিও তাগূত। শাসন-শক্তি বললে শুধু গভর্নমেন্টই বোঝায় না। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে স্বামীও শাসন-শক্তি। পরিবারে পিতা শাসন-শক্তি। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধানও শাসন-শক্তি। কিছু লোকের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ যার

www.amarboi.org

আছে, সেই শাসন-শক্তি। একটি দেশে সরকার হলো সবচেয়ে শক্তিশালী শাসন-শক্তি। কুরআনে ফিরাউন ও নমরূদকে শাসন-শক্তি হিসেবেই তাগূত বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে ফিরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ যে ভাষায় দিলেন, সেখানেও ফিরাউনকে সীমালঙ্ঘনকারী বলেই উল্লেখ করেছেন ঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى .

'হে মূসা! ফিরাউনের নিকট যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে।' (সূরা ত্বা-হা : ২৪)

শাসন-শক্তি প্রয়োগ করে অধীনস্থদের উপর আল্লাহর আইনের বিরোধী নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তারা আল্লাহর নাফরমানী করায় বাধ্য করতে পারে। তাই এসবও তাগূত। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি হলো, আল্লাহর নাফরমানী করতে অস্বীকার করা। তা না করলে ঈমানে দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

৪. রিযক বন্ধ করার ভয় দেখানোর শক্তিও তাগূত। এ তাগূতটি শাসন-শক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়ে রিযক বন্ধ করার ক্ষমতা যাদের আছে, তারা শাসন-শক্তিই বটে। তবু এটা পৃথকভাবে গণ্য করার যোগ্য তাগূত। শাসন-শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিতে পারে ও বিভিন্নভাবে ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু চাকরি থেকে বরখাস্ত করার শাস্তিটি চরম যুল্‌ম বলেই রিযক বন্ধ করার ভয় দেখানোর শক্তিকে শাসন-শক্তি থেকে আলাদাভাবে গণ্য করা হলো। এ শক্তি প্রয়োগ করে অধীনস্থদেরকে আল্লাহর নাফরমানী করতে বাধ্য করা যায় বলেই এটাও তাগূত।

৫. অন্ধভাবে মেনে চলার দাবিদার শক্তিও তাগূত। সমাজে এমন কতক লোক আছে, যারা তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে চলার জন্য নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করতে সক্ষম। তাদের দাবি হলো, বিনা যুক্তিতে তাদের কথা মেনে চলতে হবে। বিনা প্রশ্নে তাদের আনুগত্য করতে হবে। বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদের হুকুম পালনের অধিকার তারা দাবি করে।

অথচ আল্লাহ ও রাসূল (স) ছাড়া এ দাবি করার আর কারো অধিকার নেই। যেহেতু আল্লাহ নির্ভুল এবং রাসূল (স) আল্লাহর ওহী দ্বারা পরিচালিত বলে তিনিও নির্ভুল, সেহেতু এ দু'সত্তাকে বিনা দ্বিধায় শর্তহীনভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়া আর কারো এ জাতীয় আনুগত্যের দাবিদার হওয়ার অধিকার নেই। তাই

www.amarboi.org

যারা এ দাবি করে তারাও তাগূত। সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَتَّخِذُوْنَ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

'তারা তাদের ওলামা ও পীরদেরকে আল্লাহর বদলে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

হাদীসে এর অর্থ বলা হয়েছে যে, তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে নিয়েছে। তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে যে ফায়সালাই দেয় তা অন্ধভাবে স্বীকার করে নেয়।

অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার দাবিদার শক্তি ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন আছে, রাজনৈতিক ময়দানেও রয়েছে। দলের সিদ্ধান্ত, নেতা বা নেত্রীর সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক মনে হলেও অন্ধভাবে তা মানতে হয়, না মানলে দল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, এ ভয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই এ জাতীয় শক্তিও তাগূত।

তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে দীনের পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন এক পীর সাহেব মুরীদদেরকে বললেন যে, তোমরা মাওলানা মওদূদীর বই পড়বে না। পীরের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে যারা বই পড়লো না, তারা ইকামাতে দীনের পথ চিনতে ব্যর্থ হলো। আমার কয়েকজন তাবলীগী ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে মাওলানা মওদূদীর বই পড়তে দিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ পর আরও বই নিয়ে গেলাম। আগের দেওয়া বই ফেরত চাইলাম। বই ফেরত দিলেন এবং আর কোনো বই নিতেই রাজি হলেন না। জিজ্ঞেস করলাম, বই কি পড়েছিলেন? জওয়াবে বললেন, 'এসব বই পড়তে মুরুব্বীরা মানা করেছেন।' আমি বললাম, 'মুরুব্বীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কেন?' এর জওয়াবে যা বললেন তাতে বুঝলাম যে, এসব বই পড়েই আমি 'গুমরাহ' হয়েছি বলে তাদেরকে পড়তে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, 'যদি কোনো বই পড়লেই ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমন দুর্বল ঈমান কী করে রক্ষা করবেন?'

আমার খুব আফসোস হলো। যাদেরকে বই পড়তে দিয়েছিলাম তারা তাবলীগ জামায়াতে আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাদের একজন আমার হাতেই রিক্রুট হয়েছেন। তারা তাগূতের খপ্পরে পড়ে ইকামাতে দীনের পথ চেনার সুযোগ না পাওয়ায় তাদের জন্য বেদনা বোধ করেছি।
এ দীর্ঘ আলোচনায় পাঁচ রকমের তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। মযবুত ঈমানের জন্য তাগূতকে অস্বীকার করা এ কারণেই অত্যন্ত জরুরি।

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

www.amarboi.org

সূরা নাহলের ৩৬ নং এ আয়াতটিতে আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট (এ নির্দেশ দিয়ে) রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা (একমাত্র) আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক।'

নমরূদ ও ফিরাউন খোদায়ী দাবি করেছিল বলে বলা হয়। কিন্তু তারা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দাবি করেনি। তারা মানুষকে তাদের হুকুমের দাস বানিয়ে রেখেছিল। মানুষকে আল্লার দাস হতে বাধা দিয়ে নিজেদের দাস হতে বাধ্য করেছিল। এ অর্থেই তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা খোদায়ী দাবি করেছিল। তারা আধুনিক যুগের পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিল মাত্র।

তাগূতের কাজই হলো, আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরিয়ে রেখে তার দাসত্ব করতে বাধ্য করা। তাই যারা আল্লাহর দাসত্ব করতে আগ্রহী তাদেরকে সচেতনভাবে সবরকম তাগূতী শক্তিকে পরিহার করে তাদের থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কালেমায়ে তাইয়েবা তাগূতবিরোধী

কালেমায়ে তাইয়েবা لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর মূল কথা হলো, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, আর কোনো ইলাহ নেই। এ বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য اَللّٰهُ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ বললেই তো চলত। তা না করে لَآ দিয়ে কেন শুরু করা হলো? لَآ মানে নেই। নেই দিয়ে কেন শুরু করা হলো? মানব সমাজে বহু হুকুমকর্তা রয়েছে। মানবমনের উপর এরা রাজত্ব করে। মানুষ এদের হুকুম মেনে চলে; হয় বাধ্য হয়ে, না হয় লোভে পড়ে। এসব হুকুমকর্তা (ইলাহ) হলো আসলে তাগূত। তাই যারাই কালেমায়ে তাইয়েবা কবুল করতে চায় তাদেরকে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনার আগেই তাগূতকে অস্বীকার করতে হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে যে ফরমে فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ বলা হয়েছে সে ফরমেই প্রথমে অস্বীকার দ্বারা শুরু করা হয়েছে। ঐ আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগেই তাগূতের কুফরী করতে বলা হয়েছে। لَآ اِلٰـهَ দ্বারা তাগূতকে অস্বীকার করার ঘোষণা দেওয়ার পরে اِلَّا اللّٰهُ বলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এটা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

যারা তাগূতের পরিচয় জানে না, তারা 'লা ইলাহা' দ্বারা কাদেরকে অস্বীকার করা হচ্ছে তা বুঝতেই পারে না। তারা না বুঝে তোতাপাখির মত কালেমা উচ্চারণ করে থাকে এবং তাগূতের দাসত্ব করতে থাকে।

www.amarboi.org

একটি সহজ উদাহরণ

জমিতে ধানের বীজ বপন করতে হলে প্রথমেই জমিকে আগাছামুক্ত করতে হবে। আগাছা দূর না করে ধান ফেললে ফসল তো দূরের কথা, বীজ ধানও ফিরে পাওয়া যাবে না। কৃষিজমি যেমন খালি থাকে না, মানুষের মনের জমিও খালি থাকে না। ঐ ৫ রকম তাগূত মানবমন দখল করে থাকে। মনে ঈমানের বীজ ফেলতে হলে মন থেকে প্রথমে সব তাগূতকে তাড়াতে হবে। তা না হলে মনের যমীনে ঈমানের বীজ বপনের জায়গাই হবে না।

তাগূতের সারকথা

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিনকে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য পয়দা করেছেন। আল্লাহ সূরা আয যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে ঘোষণা করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

'আমি জিন ও ইনসানকে আমার দাসত্ব করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।'

এ কথার একটি মর্ম হলো, আল্লাহ শুধু তাঁরই দাসত্ব করার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর কারো দাসত্ব করার জন্য নয়। তাই যারা আল্লাহর দাসত্বের বদলে কোনো সৃষ্টির দাসত্ব করে, তারা নিজেদেরকেই হেয় করে এবং মানুষ হিসেবে মর্যাদা হারায়– তারা পশুর পর্যায়ে গণ্য হয়।

ঐ কথাটির অপর মর্ম হলো, যারা আল্লাহর দাসত্ব করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রভুত্ব করার অপচেষ্টা চালায় তারাই তাগূতে পরিণত হয়। তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের বান্দাহ বানায়। শাসন-শক্তি, রিযক বন্ধ করে দেওয়ার ভয় দেখানোর শক্তি ও অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি হিসেবে তারা আল্লাহর বান্দাহদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে চরম সীমালঙ্ঘনকারীতে পরিণত হয়।

এসব শক্তি আল্লাহর দাসত্ব করা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাদের দাসত্ব করতে বাধ্য করে। তাই আল্লাহর দাসত্ব করতে হলে এসব শক্তিকে মানতে অস্বীকার করার সাহস থাকতে হবে। এ সাহস যাদের নেই তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবিদার হলেও পদে পদে তাগূতের নিকট পরাজিত হতে থাকবে।

সূরা 'আনকাবূতের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ ـ

www.amarboi.org

'মানুষ কি মনে করে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দেওয়া হবে?'

ঈমানের পরীক্ষা আসে তাগূতের মাধ্যমে। তাগূতকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত না থাকলে পরীক্ষায় অবশ্যই ফেল করবে।

মযবুত ঈমানের সুফল

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহকে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে মেনে চলার সিদ্ধান্তই ঈমান। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হলে ঈমানের দাবি পূরণ করতে হবে। ঈমানের দাবি পূরণ করতে হলে ঈমানকে দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না। ঈমানকে শুধু দুর্বলতামুক্ত রাখাই যথেষ্ট নয়, ঈমানকে অত্যন্ত মযবুত করার জন্য ঐ দুটো শর্তই পূরণ করতে হবে।

যে মযবুত ঈমানের অধিকারী সে –

১. দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধায় ভোগে না। সব অবস্থায় মনে প্রশান্তি ভোগ করে এবং তৃপ্তি বোধ করে। এ প্রশান্তি ও তৃপ্তি এমন বেহেশতী নিয়ামত, যার কোনো তুলনা নেই।

২. আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যের তীব্র কামনা এমনভাবে অন্তর দখল করে রাখে যে, দুনিয়ার কোনো বড় স্বার্থের লোভেও বিভ্রান্ত হয় না।

৩. আল্লাহ সবসময় সাথে আছেন—এ চেতনার ফলে দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ ও রোগ-শোকে বিচলিত ও পেরেশান হয় না এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ও সবরের নিয়ামত লাভ করে।

৪. একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া মৃত্যুভয়সহ সকল ভয় থেকে মুক্ত থাকে। মৃত্যুকে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার মহাসুযোগ মনে করে এবং শহীদী মৃত্যুই কামনা করে।

৫. দুনিয়ার যেসব জিনিসের ভালোবাসার দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছেন, এসবের আকর্ষণ সত্ত্বেও আল্লাহ, রাসূল (স) ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা হাসিল করে।

৬. সকল প্রকার শির্‌ক থেকে ঈমানকে মুক্ত রেখে তাওহীদের দাবি পূরণ করতে সক্ষম হয়।

৭. সকল প্রকার তাগূতকে অস্বীকার করার হিম্মত রাখে এবং ঈমানের দাবি পূরণ করে তৃপ্তিবোধ করে।

www.amarboi.org

সহীহ ইল্‌ম

ইল্‌ম মানে কী?

ইল্‌ম শব্দের আভিধানিক অর্থ জ্ঞান (Knowledge)। কুরআন ও হাদীসে কোনো কোনো স্থানে এ সাধারণ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হলেও ইসলামী পরিভাষায় ইল্‌ম মানে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। রাসূল (স) বলেছেন, ইল্‌ম তালাশ করা ফরয। যদি এখানে সব জ্ঞানই ফরয বুঝায় তাহলে নবীর পক্ষেও এ ফরয পালন করা সম্ভব নয়।

ইল্‌ম মানে জানার বিষয়। কোনো প্রাণীই ইল্‌ম ছাড়া বাঁচতে পারে না। পশু-পক্ষী এবং কীট-পতঙ্গেরও জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। পাখিকে উড়তে জানতে হবে। হাঁসকে সাঁতার জানতে হবে। মৌমাছির ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করার জ্ঞান দরকার। প্রতিটি জীবকেই বেঁচে থাকার জন্য খেতে হয়। সবার খাদ্য এক রকম নয়। কার খাদ্য কোন্‌টা তা জানতেই হবে।

প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব বাসস্থান প্রয়োজন। পাখি গাছে বাসা বানাতে জানে। শেয়াল মাটিতে গর্ত করে থাকার ব্যবস্থা করে। এ ব্যবস্থা করতে না জানলে তা করতে পারতো না।

জ্ঞান কোথা থেকে পাওয়া যায়?

যিনি সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তিনি জ্ঞানের একমাত্র উৎস। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার হয় না। তাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য স্কুল কলেজের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই তাদেরকে যার যার প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেন। মৌমাছিকে মৌচাকের মতো চমৎকার শিল্প রচনার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন বলে কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং তা ওহীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকেই ওহী বলা হয়। ওহীর শাব্দিক অর্থ হলো ইশারা, ইঙ্গিত, গোপনে দেওয়া ইত্যাদি। যার কাছে ওহী আসে সে তার চেষ্টা ছাড়াই তা পায়। স্রষ্টা গোপনে তাকে তা দেন। হাঁসের বাচ্চাকে তিনি গোপনেই সাঁতার শিক্ষা দেন। সে বিনা চেষ্টায়ই এ শিক্ষা পেয়ে যায়।

মানুষের কেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়?

মানুষ আর সব প্রাণীর মতো নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা (আশরাফুল মাখলুকাত) হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন। সকল প্রাণীই দেহসর্বস্ব, কিন্তু মানুষ দেহসর্বস্ব নয়। মানুষের দেহটি আসল মানুষ নয়। মানুষের দেহটি

www.amarboi.org

পশুই বটে। আসল মানুষটি কুরআনের ভাষায় 'রূহ'। মানুষের দেহটি বস্তু দিয়ে তৈরি। মানুষ যা কিছু খায় ও পান করে তাতে যেসব বস্তু-উপাদান রয়েছে সেসব উপাদান দিয়েই মানুষের দেহ তৈরি হয়েছে। তাই ঐসব খাদ্য ও পানীয় মানব দেহে 'ফিট' হয়। অন্য কোনো উপাদান দেহ গ্রহণ করবে না। বিষ খেলে দেহের মৃত্যু হবেই।

'রূহ' কোনো বস্তু সত্তা নয়। আমরা বিবেক বলতে যা বুঝি সেটা রূহ। এটা নৈতিক সত্তা। ভালো ও মন্দের চেতনাই হলো রূহ। এটাই আসল মানুষ। গোটা সৃষ্টিজগৎ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। সব সৃষ্টিকে কাজে লাগাবার উপযোগী হাতিয়ার হিসেবেই দেহটি দান করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির জন্যই প্রতিটি সৃষ্টির উপযোগী বিধান তৈরি করে তা নিজেই তাদের উপর চালু করে দিয়েছেন। মানুষের দেহের জন্যও তিনি বিধান তৈরি করে নিজেই জারী করেছেন। এসব বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। নবীর মাধ্যমে যেসব বিধান পাঠানো হয়েছে তা আল্লাহ নিজে জারী করেন না। নিজেই জারী করার সিদ্ধান্ত থাকলে নবীর মাধ্যমে পাঠাতেন না।

নবীর নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে চালু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নবীর উপর ও নবীর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের উপর। বিধানটি অবশ্যই আল্লাহর। তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা) হিসেবে ঐ বিধান জারী করার দায়িত্বটিই খিলাফতের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে মানুষকে তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও চেষ্টা সাধনা প্রয়োগ করতে হবে। এ কাজ সচেতনভাবে করা ছাড়া উপায় নেই। অন্যান্য প্রাণী বিনা পরিকল্পনায় চেতনাহীন ও গতানুগতিক ধারায় জীবন যাপন করে। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে এভাবে পরিচালনা করেন। এর কোনো চেতনা তাদের নেই।

মানুষকে সচেতনভাবে ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সুপরিকল্পিতভাবে তার দেহসত্তাকে পরিচালনা করা এবং সৃষ্টিজগৎকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দেওয়া বিধানকে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ দায়িত্বই আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করে অর্জন করতে হবে। তাই দুনিয়ায় মানুষের নৈতিক গুণাবলি অর্জনের জন্য সচেতনভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। অন্যান্য পশুর প্রয়োজনীয় গুণাবলি যেমন তাদের মধ্যে আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়, মানুষের বেলায় তা হতে পারে না।

www.amarboi.org

জ্ঞানই শক্তি

"Knowledge is power" এ কথাটি স্কুল জীবনেই পাঠ্য বইতে পড়েছি। কিন্তু এর মর্ম তখনো ভালোভাবে বুঝিনি। জ্ঞানের বলেই মানুষ শক্তিমান বিশালকায় প্রাণী এমনকি হিংস্র পশুকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জ্ঞানের শক্তিতেই মানুষও মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে। রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর মুসলিম জাতি জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে এবং যতদিন ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষায়ও তাদের প্রাধান্য ছিল ততদিনই তারা মানব জাতির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছেন।

মুসলিম জাতি ইসলামী আদর্শের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের প্রাধান্যের কারণেই কয়েক'শ বছর বিশ্বে কর্তৃত্বের আসন দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যখন মুসলিম জাতি রাষ্ট্রক্ষমতাকে ভোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদের শাগরিদরাই পাশ্চাত্য মুসলিমদের থেকেও অগ্রসর হয়ে গেল তখন তারা জ্ঞানের প্রাধান্য বলেই মুসলিম দেশগুলো দখল করে নিলো। আজও বিশ্বে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এ জ্ঞান শক্তির দরুনই অব্যাহত রয়েছে।

ওহীর জ্ঞানের শক্তি

সকল শক্তির উৎস আল্লাহ তাআলা। তাই ওহীর জ্ঞানের শক্তিকে তিনি অন্যান্য জ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের যুগে ওহীর জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলে সে যুগের অন্যান্য জ্ঞানে উন্নত রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিম জাতির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। মুসলিম জাতি পার্থিব যাবতীয় জ্ঞানের শক্তি আহরণ করে মানব জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

আজও আবার মুসলিম জাতি ওহীর জ্ঞানকে মানব সমাজে বিজয়ী করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলে অতীতের মতোই রাষ্ট্র শক্তির অধিকারী হয়ে মানব জাতির নেতৃত্বের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে এগিয়ে যেতে পারে।

'ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি' নামক পুস্তকে মাওলানা মওদূদী বলিষ্ঠ যুক্তি ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় গুণের সমন্বয় হলে শুধু মানবীয় গুণের অধিকারীরা তাদের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সত্ত্বেও মুসলিমদের নিকট পরাজিত হতে বাধ্য।

ওহীর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ অবশ্যই বহাল রাখেন। কিন্তু ওহীর জ্ঞানকে বিজয়ী করার দায়িত্বে অবহেলা করে মুসলিম জাতি শুধু পার্থিব অন্যান্য জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব

www.amarboi.org

অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। কারণ এ বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। দায়িত্বে অবহেলার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণেই তারা নেতৃত্বের অযোগ্য বলে গণ্য।

জ্ঞানের উৎস কী কী?

জ্ঞানের উৎস (Source of Knowledge) চারটি। যথা–

১. ইন্দ্রিয় : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে মানুষ জন্মের পর থেকেই জ্ঞান আহরণ করতে থাকে। এ জ্ঞান সরাসরি প্রত্যক্ষ বা Direct পদ্ধতিতে অর্জিত হয়। এসব হাতিয়ার ও জানার বিষয়ের মাঝখানে আর কোনো মাধ্যম নেই। এ চারটি যন্ত্রের এক একটি দ্বারা বিশেষ ধরনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। এক যন্ত্র দিয়ে অপর যন্ত্রের উপযোগী বিষয় জানা যায় না। গন্ধের জ্ঞান শুধু নাক দিয়েই হাসিল করা যায়। অন্য চারটি যন্ত্রের সাহায্যে তা জানার উপায় নেই। ইংরেজিতে এ সবকে External sense organs বলা হয়।

২. বুদ্ধি : (Intelligence) আরবীতে আকল (عَقْل বা شُعُوْر)। মানুষ বুদ্ধির মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের জন্য বুদ্ধিই সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। ইন্দ্রিয় দ্বারা যতটুকু জানা যায় এরপর বুদ্ধিই মানুষকে জ্ঞানের ময়দানে আরও এগিয়ে দেয়।

চোখ দিয়ে কোথাও ধোঁয়া দেখা গেল। বুদ্ধি বলে উঠলো আগুন লেগেছে। চোখ কিন্তু আগুন তখনো দেখেনি। বুদ্ধি জানে যে, আগুন লাগলেই ধোঁয়া হয়। কার্যকারণের যুক্তি বুঝবার ও বিশ্লেষণ করার শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। এ শক্তি বলেই মানুষ জ্ঞানের মহাসমুদ্র থেকে জ্ঞান ভাণ্ডার আহরণ করে। গবেষণা ও জ্ঞান সাধনার প্রধান হাতিয়ারই বুদ্ধি। এ শক্তি বলেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মানুষ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সৃষ্টিজগৎকে জানা এবং তাকে কাজে লাগাবার যোগ্যতা অর্জন করা বুদ্ধির সাহায্যেই সম্ভব হয়।

৩. ইলহাম : এটা বুদ্ধির উর্ধ্বের এক বিশেষ উৎস। যারা যে বিষয়েই চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও সাধনায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন, কখনো কখনো হঠাৎ কোনো জ্ঞান তাদের বুদ্ধির নিকট এসে ধরা দেয়। হয়তো দীর্ঘদিন বুদ্ধি প্রয়োগ করেও কোনো তত্ত্ব আয়ত্ত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, হঠাৎ ঐ তত্ত্বটি তার জ্ঞানে এসে গেল। এ ধরনের জ্ঞানকেই ইলহামী জ্ঞান বলা হয়। এর বাংলা পরিভাষা 'প্রজ্ঞা' হতে পারে। ইংরেজিতে Intuition অর্থ অভিধানে যা পাওয়া যায় তা হলো– "Immeediate apprehension by mind without reasoning" অর্থাৎ যুক্তি ছাড়াই হঠাৎ মনে কোনো ধারণা সৃষ্টি হওয়া।

www.amarboi.org

আরবীতে ইলহাম শব্দটি আরও স্পষ্ট। বুদ্ধি-শক্তি প্রয়োগ করেও যে তত্ত্বটির নাগাল পাওয়া গেল না, হঠাৎ তা বুদ্ধির আওতায় এসে গেল। তাই আমরা জ্ঞানের এ উৎসটিকে ইলহাম বলেই উল্লেখ করা যথার্থ মনে করি। বাংলায় এর অনুবাদের প্রয়োজন নেই।

এটা অবশ্যই সত্য যে, যারা জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত ইলহামী জ্ঞান তাদেরই আয়ত্তে আসে, যদিও ঐ জ্ঞানটি সাধনার সরাসরি ফসল নয়।

এ জাতীয় জ্ঞানের কয়েকটি উদাহরণ

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে বাস্তব জীবনে পালন করার উদ্দেশ্যে ইজতিহাদ করে মাসআলা-মাসায়েল বের করেছেন। কোনো কোনো সময় এমন ঘটনা ঘটেছে যে, দীর্ঘ সময় চিন্তা-গবেষণা করেও যে মাসআলাটির মীমাংসা করতে পারেননি, তা এক সময় হঠাৎ তাঁর মনে ধরা দিল। সকল মুজতাহিদের জীবনেই হয়তো এমন ঘটনা ঘটে।

খ. আধুনিক বিজ্ঞানের জনক হিসেবে গণ্য মহাবিজ্ঞানী নিউটনের জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করছি। তিনি আপেলের বাগানে বসে আছেন। তাঁর সামনেই গাছ থেকে একটা আপেল মাটিতে খসে পড়লো। জীবনে বহুবারই এমন দৃশ্য তিনি দেখেছেন। কিন্তু হঠাৎ সেদিন তাঁর মনে এ প্রশ্ন বিরাট হয়ে দেখা দিল যে, আপেলটি উপরে বা ডানে-বাঁয়ে না যেয়ে সোজা মাটির দিকে কেন আসল? চারদিকেই তো শূন্যতা বিরাজ করছে। কোনো দিকে না যেয়ে শুধু নিচের দিকে কেন এলো? তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, নিশ্চয়ই এমন কোনো শক্তি রয়েছে, যা আপেলটিকে মাটির দিকে টেনে এনেছে। এই হাইপথেসিস-এর উপর গবেষণা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত মতবাদ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Law of Gravitation) আবিষ্কার করেন।

গ. গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমেডিসের ঘটনা। বিজ্ঞানের একটি সূত্র তালাশ করে না পেয়ে তিনি রীতিমতো বিষণ্ন ও বিমর্ষ অবস্থায় পানির টবে গোসল করছিলেন। যারা পানি ভর্তি টবে গোসল করে তারা উলঙ্গ অবস্থায়ই পানিতে নাক জাগিয়ে শুয়ে থাকে। তিনিও ঐ অবস্থায়ই ছিলেন। হঠাৎ ঐ সূত্রটি তাঁর জ্ঞানে এসে ধরা দিল। সাফল্যের আনন্দে তিনি টব থেকে নেমে 'ইউরেকা-ইউরেকা' (পেয়েছি, পেয়েছি) বলে চিৎকার করে উঠলেন। বস্ত্রহীন অবস্থায়ই তিনি বাথরুম থেকে বের হয়ে গেলেন। খুশির আতিশয্যে গায়ে জামা পরার হুঁশ ও রইল না।

www.amarboi.org

৪. ওহী : জ্ঞানের এ মহা উৎসটি কোনো মানুষের আয়ত্তে নেই। আল্লাহ তাআলা যাকে নবী রাসূল নিয়োগ করেন তার নিকটই তিনি বিশেষ পদ্ধতিতে ওহীর জ্ঞান পরিবেশন করেন। এ জ্ঞান নবী-রাসূলের চেষ্টা সাধনার ফসল নয়। সরাসরি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা লাভ করেন।

হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিভাবে রাসূল (স)-এর নিকট ওহীর জ্ঞান পৌঁছতো। কয়েক পদ্ধতিতে তিনি ওহী লাভ করতেন।

ক. স্বপ্নযোগে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি জ্ঞান লাভ করতেন।

খ. কোনো কোনো সময় ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পেতেন। তখন তিনি স্থির হয়ে থাকতেন এবং ওহী লাভ করতেন। এ পদ্ধতিটি তাঁর জন্য বেশ কষ্টকর হতো। তিনি প্রচণ্ড চাপ বোধ করতেন। শীতের সময়ও তাঁর চেহারা মুবারক থেকে ঘামের ফোঁটা টপকে পড়তো। উটের পিঠে বসা থাকলে চাপের কারণে উট মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য হতো।

গ. কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকারে এসে রাসূল (স)-কে তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিতেন।

ঘ. রাসূল (স)-এর মনে ওহীর জ্ঞান ঢেলে দেওয়া হতো।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতিতে প্রাপ্ত জ্ঞানই ভাষাসহ নাযিল হতো এবং তা কুরআনের অংশ হিসেবে গণ্য হতো। এ প্রকারের ওহীকে ওহী মাতলূ' বলা হয়, যা তিলাওয়াত করা হয়।

প্রথম ও চতুর্থ পদ্ধতিতে যে ওহী আসতো তাতে রাসূল (স)-এর মনে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাবের আকারে জ্ঞান দেওয়া হতো। কুরআনের আয়াতের মতো ভাষায় নাযিল হতো না। রাসূল (স) আল্লাহর দেওয়া ঐ সব ভাবকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করতেন। এসব জ্ঞানই হাদীস হিসেবে পরিচিত। এ ওহী হলো গাইরি মাতলূ', যা কুরআনের মতো তিলাওয়াত করার জন্য নয়।

ওহীর জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক। কুরআনের বাইরে ওহীর জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে। রাসূল (স) যা বলেছেন (قَوْل) যা করেছেন (فِعْل) ও সাহাবায়ে কেরামের যেসব কথা ও কাজকে আপত্তিজনক বলে উল্লেখ করেননি (تَقْرِيْر) তা সবই ওহীর জ্ঞানের মধ্যে শামিল।

কুরআনে যা আছে এর ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ আল্লাহর। তাই এর কোনো কিছু মানতে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। আর বাকি ওহীর কোনো কথা যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে কাফির বলে গণ্য করা হয় না।

www.amarboi.org

রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়। হাদীস থেকে মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ যা সুন্নাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন তা কুরআনেরই বাস্তব ব্যাখ্যা। কুরআন ও সুন্নাহ মিলেই ইসলাম। যারা সুন্নাহকে অস্বীকার করে তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য নয়।

সহীহ ইল্‌মের গুরুত্ব

সকল জ্ঞানই বিশুদ্ধ বা খাঁটি নয়। নির্ভুল জ্ঞানকেই আরবীতে সহীহ বলা হয়। যেমন বুখারী শরীফের নাম 'সহীহ আল-বুখারী'।

জ্ঞান ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। যা-ই করা হোক সে বিষয়ে জ্ঞান ছাড়া তা করা সম্ভব নয়। কর্মের পেছনে জ্ঞানই চালিকা শক্তি। কিন্তু জ্ঞান যদি নির্ভুল না হয় তাহলে কর্মের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, সহীহ জ্ঞান না থাকলে জীবনই বিপন্ন হতে পারে। গাড়ির ড্রাইভার যদি সঠিক জ্ঞানের অধিকারী না হয় তাহলে এক্সিডেন্ট করে গাড়ি ধ্বংসের সাথে সাথে নিজের জীবনও হারাতে পারে। তাই সব বিষয়েই যা সঠিক জ্ঞান তা অর্জন করতে হবে। ভুল জ্ঞান মারাত্মক।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণই যথেষ্ট– সকল মানুষই সুখ-শান্তি চায়। এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না, যে সুখ-শান্তি পছন্দ করে না। যে যাই করে নিজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই করে। এমনকি যে আত্মহত্যা করে সেও সুখ-শান্তি পাওয়ার নিয়তেই করে। সে মনে করে যে তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই বেশি ভালো। এ বিষয়ে তার নিয়ত যতই সহীহ হোক তার জ্ঞান মোটেই সহীহ নয়।

দুনিয়ায় সবাই সুখ-শান্তি চায় এবং যা কিছু সে করে এ উদ্দেশ্যেই করে। অথচ ক'জন সত্যিকারার্থে সুখ-শান্তি ভোগ করে? সুখ-শান্তি পাওয়ার নিয়তেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি করে এবং পরিণামে দুনিয়াতেই চরম অশান্তি ভোগ করে। এর একমাত্র কারণই হলো সহীহ জ্ঞানের অভাব।

কোনো মেশিন যে বানায় সে-ই এর সঠিক ব্যবহারের সহীহ জ্ঞান রাখে। তাই ঐ মেশিন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা স্পষ্ট ভাষায় ছবি এঁকে লিখে দেয়। ঐ নিয়মে ব্যবহার করলেই মেশিন ব্যবহারের উদ্দেশ্য সফল হবে। ঐ সহীহ জ্ঞানের বদলে যদি ভুল নিয়মে ব্যবহার করে তাহলে মেশিনই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তার নিজের দেহ ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে নবী রাসূলের মাধ্যমে সহীহ জ্ঞান দিয়েছেন। এ জন্য প্রথম মানুষটিকে নবী হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে সহীহ জ্ঞানের অভাবে কেউ বিপদে না পড়ে।

www.amarboi.org

আধুনিক বিশ্বে যারা নিজ দেশের বা মানব জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা Divine Guidance-এর কোনো প্রয়োজনই বোধ করেন না। তাঁরা মেধা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করেন। তাই তারা মানব সমাজকে সুখ-শান্তি দেবার সহীহ নিয়ত থাকা সত্ত্বেও চরম অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য করছেন। সূরা রূমের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

'জলে স্থলে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা মানুষের দু-হাতের কামাই।'

আল্লাহ তাআলা বলতে চান যে, অশান্তি ও বিপর্যয় তিনি জোর করে মানব সমাজের উপর চাপিয়ে দেননি। মানুষ নিজেরাই নিজেদের মনগড়া ভ্রান্ত জ্ঞানের কারণে অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

সহীহ ইল্‌মের উৎস

উপরে যে চারটি জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ সবের মধ্যে একমাত্র ওহীর জ্ঞানকেই নিশ্চিতরূপে সহীহ মনে করতে হবে। অন্য তিনটি উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান শুদ্ধও হতে পারে, অশুদ্ধও হতে পারে। তাই ওহীর জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সহীহ কিনা, সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল ও ব্যাপক। যুগে যুগে বহু মনীষীর আহরিত জ্ঞান ঐ মহা ভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। কোনো জ্ঞান অমুসলিম মনীষীর চিন্তার ফসল হলেও ওহীর কষ্টিপাথরে যাচাই না করে তা পরিত্যাগ করা মোটেই উচিত নয়। আর মুসলিম কোনো মনীষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকেও ওহীর মানদণ্ডে যাচাই না করে সহীহ বলে গ্রহণ করা উচিত নয়।

তাই মানব জাতির মধ্যে প্রতিটি দেশেই ওহীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ একদল মানুষ সকল যুগেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশেষ করে যারা নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করবে তারা ওহীর জ্ঞানে আলোকিত না হলে মানব সমাজের কেমন দুর্দশা হয় তা আধুনিক বিশ্বে বাস্তবে প্রমাণিত।

কোন্ ইল্‌ম তালাশ করা ফরয?

রাসূল (স) ইরশাদ করেন ঃ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

'প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) উপর ইল্‌ম তালাশ করা ফরয।'

www.amarboi.org

এখানে ইল্‌ম দ্বারা একমাত্র ওহীর ইল্‌ম বুঝতে হবে। দুনিয়ার সকল ইল্‌ম হাসিলের চেষ্টা করা ফরয হতে পারে না। কোনো অসম্ভব কাজের দায়িত্ব রাসূল (স) মানুষের উপর চাপাতে পারেন না। কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই ওহীর জ্ঞানে পরিচালিত। আগেই বলেছি, কুরআন ও হাদীসের পরিভাষা হিসেবে ইল্‌ম মানেই ওহীর ইল্‌ম।

ইল্‌ম কতটুকু ফরয?

ফরয মানে অবশ্য পালনীয়, যা পালন না করলে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, ওহীর ইল্‌ম তো বিশাল ও ব্যাপক। ৩০ পারা কুরআন এবং লক্ষ লক্ষ হাদীস সবইতো ওহীর ইল্‌ম। যদি এ ইল্‌মের সবটুকু অর্জন করা ফরয হয় তাহলে রাসূল (স) ছাড়া আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাহলে নিশ্চয়ই ওহীর সবটুকু ইল্‌মই তালাশ করা ফরয হতে পারে না।

তাহলে এটা কেমন করে নির্ণয় করা যাবে যে, কতটুকু ইল্‌ম হাসিল করা ফরয? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব না জানলে মুসলিম হিসেবে সঠিকভাবে জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব।

একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব সহজেই বুঝে আসবে। যার উপর হজ্জ-যাকাত ফরয নয়, তার ঐ বিষয়ে জানা আবশ্যক নয়। যার উপর যাকাত ফরয তাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হলে ওহীর ইল্‌ম থেকে জানতে হবে যে, কোন্ কোন্ সম্পদের কী পরিমাণের মালিক হলে যাকাত ফরয হয় এবং এর হিসাব কিভাবে করতে হয়, কত মালের কত পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হয় এবং কোন্ কোন্ খাতে যাকাত খরচ করলে ফরযটি সঠিকভাবে আদায় হবে। যার উপর যাকাত ফরয নয় তার এ সব বিষয়ে জানা জরুরী নয়।

এ একটি মাত্র উদাহরণ থেকে ঐ প্রশ্নের সহীহ জওয়াব পাওয়া যায়। জওয়াবটি তাহলে এভাবে প্রকাশ করলে বুঝতে সহজ হবে।

যার উপর যে দায়িত্ব পালন করা ফরয, সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের প্রয়োজনে ওহীর যতটুকু ইল্‌ম জানা জরুরী ততটুকু ইল্‌ম অর্জনই ফরয। এ দায়িত্ব বলতে শুধু ধর্মীয় বিষয়ই বুঝায় না। মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে হলে যত রকম দায়িত্ব পালন করতে হয় সে সবই এর আওতায় পড়ে। কেননা মুমিনের জীবনে দুনিয়াদারি ও দীনদারিতে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী যে কাজ করা হয় তা-ই দীনদারি। আয়-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি দায়িত্ব শরীআত মোতাবেক

www.amarboi.org

করাও দীনদারি। লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে লাখ টাকার পশু কুরবানী দিলে বা নিজের নামে আলহাজ্জ লেখার নিয়তে হজ্জ করলে তা দুনিয়াদারিতে পরিণত হয়। দানশীল হিসেবে সুনামের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করার পুরস্কার আখিরাতে পাবে না এবং বীর ও বাহাদুর হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্য জিহাদের ময়দানে শহীদ হলেও দোযখে যেতে হবে বলে রাসূল (স) বলেছেন।

মুমিনের দু'দফা ঘোষণা

আসলে মুমিন ও মুসলিম ঐ লোককেই বলা হয়েছে, যে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করা মানে না বুঝে কোনো মন্ত্র জপা নয়; আসলে এ দুটো ঘোষণা জীবনের নীতি নির্ধারণী দুটো দফা (Two point of life policy Declaration)

প্রথম দফা হলো, আমি আল্লাহর হুকুম মেনে চলব, এর বিপরীত কোনো হুকুমই মানব না।

দ্বিতীয় দফা হলো, আল্লাহর প্রতিটি হুকুম আমি একমাত্র রাসূলের শেখানো তরীকা অনুযায়ী পালন করব, আর কোনো তরীকা আমি গ্রহণ করব না।

এ দুটো ঘোষণা অনুযায়ী দুনিয়ার জীবনে যে কাজই করা হোক তা দীনদারি হিসেবে গণ্য।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানসর্বস্ব নয়। দীন ইসলাম মানে ইসলাম ধর্ম নয়। দীন ইসলাম মানে ইসলামী জীবনব্যবস্থা। দীন মানে আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে জীবন যাপনের বিধানের নামই দীন ইসলাম। এর অনুবাদ 'ইসলাম ধর্ম' নয়। এ অনুবাদে ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম বুঝায়। তাই 'ইসলাম ধর্ম' কথাটি মারাত্মক ভুল অনুবাদ। আল্লাহ ও কুরআন শব্দ দুটোর অনুবাদ না করেই আমরা বলে থাকি। দীন ইসলামেরও অনুবাদের প্রয়োজন নেই। এর মর্ম বুঝে নিলেই যথেষ্ট। যেমন আল্লাহ, কুরআন ও রাসূল বললে আমরা অনুবাদ ছাড়াই বুঝি।

কালেমা তাইয়্যেবার এ ব্যাখ্যা যারা সঠিক মনে করে তারা দুনিয়াদারি ও দীনদারিকে আলাদা মনে করে না। তাই তার পার্থিব দায়িত্বও আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী পালন করতে হবে বলে বিশ্বাস করে। তাই প্রতিটি দায়িত্বের ব্যাপারেই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা জানা ফরয।

www.amarboi.org

কতক উদাহরণ

১. আজ একজন যুবক ও একজন যুবতীর মধ্যে বিবাহের বন্ধন হলো। তাদেরকে মুসলিম স্বামী ও মুসলিম স্ত্রী হিসেবে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে হবে। তাই এ বিষয়ে যতটুকু ওহীর ইল্‌ম জানা প্রয়োজন তা অর্জন করা ফরয। গতকাল পর্যন্তও তা জানা ফরয ছিল না। যদি তারা তা না জানে তাহলে তারা কাফির দম্পতির মতোই জীবন যাপন করবে।

২. যেদিন এ দম্পতির ঘরে সন্তান আসবে সেদিন পিতা ও মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে ওহীর জ্ঞান তালাশ তাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে।

৩. একজন ব্যবসায়ী যদি মুসলিম হিসেবে ব্যবসা করতে চান তাহলে এ বিষয়ে ওহীর জ্ঞান হাসিল করা তার উপর ফরয। যদি তা তিনি না জানেন তাহলে তিনি কাফির ব্যবসায়ীর মতোই দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. যদি কোনো মুসলিমের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাহলে এ সংক্রান্ত যাবতীয় ইল্‌ম হাসিল করা তার উপর ফরয হয়ে যাবে। তা না জানলে তিনি কাফির শাসকের মতোই দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি নিজেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে দাবি করুন আর নাই করুন, বাস্তবে তিনি মুসলিম শাসক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না।

৫. যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি বিচারকের আসনে বসেন তাহলে তাকে বিচার সম্পর্কে শরীআতের যাবতীয় বিধান আয়ত্ত করতে হবে। তা না হলে কাফির বিচারকের মতো তাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিচারকের আইন রচনার ক্ষমতা নেই। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ীই তাঁকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসত্ত্বেও ন্যায় বিচারের দায়িত্ব পালনের জন্য শরীআতের বিধান তাকে জানতে হবে এবং যথাসাধ্য তা প্রয়োগ করতে হবে।

নফল ইল্‌মের মর্যাদা কী?

যার উপর যাকাত ফরয নয় তার জন্য তো ঐ বিষয়ে ওহীর ইল্‌ম তালাশ করা ফরয নয়; কিন্তু সে যদি তা অর্জন করে তাহলে তা নফল হিসেবেই গণ্য হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, নফল ইল্‌ম হাসিলের মর্যাদা কতটুকু?

তেমনিভাবে যে এখনও বিয়ে করেনি সে যদি দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে ওহীর ইল্‌ম অর্জন করে তাহলে এ কাজটি কি বেহুদা বা ফালতু কাজ বলে গণ্য হবে?

যার উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেই সে যদি এ বিষয়ে ইল্‌ম অর্জন করে তাহলে এটাকে কি বেগার শ্রম মনে করা হবে?

www.amarboi.org

একটি হাদীস থেকে এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জওয়াব পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো,

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا ـ

'রাতের কিছু সময় ইল্‌ম চর্চা করা (শেখানো ও শেখা) সারা রাত জেগে (অন্য নফল ইবাদতে) থাকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, সকল নফল ইবাদতের মধ্যে নফল ইল্‌ম চর্চা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এ কারণেই যে আলেম নয় শুধু আবেদ তার তুলনায় আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব হাদীসে চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছেঃ যে দীনের ইল্‌ম হাসিল করেনি বটে, কিন্তু প্রচুর নফল ইবাদত করে সে ব্যক্তির চেয়ে একজন আলেম শ্রেষ্ঠ, যদিও তিনি এত নফল এবাদত হয়তো করেন না। এর দ্বারা সকল নফল ইবাদতের মধ্যে নফল ইল্‌ম চর্চার মর্যাদা অনেক বেশি বলে প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে ৩টি হাদীসই যথেষ্ট। রাসূল (স) ইরশাদ করেন।

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ـ

'আবেদের উপর আলেমের তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব যেমন তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর আমার মর্যাদা।'

وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ فِىْ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ـ

'আবেদের উপর আলেমের তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব, যেমন সকল তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব।'

فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

'শয়তানের উপর একজন ফকীহ (ইসলামী বিধানে জ্ঞানী) ব্যক্তি এক হাজার আবেদের চেয়েও শক্তিমান।'

ওহীর ইল্‌মের এ মর্যাদার কারণেই প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলিমের জন্য ইসলামের জ্ঞান অর্জনের সকল সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। যদি সব সময় ইসলামী সাহিত্য সঙ্গে রাখা হয় তাহলে সুযোগ পেলেই তা থেকে ইল্‌ম হাসিল করা যায়। আর সুযোগ তো পাওয়াই যায়।

১. কারো সাথে দেখা করতে গেলে কোনো কারণে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হলে সময় পাওয়া যায়। যিকর করে বা দরূদ পড়েও এ সময়টা কাটানো যায়। কিন্তু ইল্‌ম হাসিল করার মর্যাদা অনেক বেশি।

২. জলপথে, সড়কপথে ও বিমানে প্রচুর সময় বেকার কেটে যায়। সাথে ইসলামী বই থাকলে সময়টা শ্রেষ্ঠ কাজে লাগানো যায়।

www.amarboi.org

৩. শহরে যানজটে পড়লে দীর্ঘ সময় নষ্ট হয়ে যায়। সাথে ইসলামী সাহিত্য থাকলে সময়টা সেরা কাজে ব্যয় হতে পারে।

৪. বিছানার পাশে ইসলামী বই থাকলে ঘুম আসবার আগে কিছু ইল্‌ম হাসিল করা যায়।

৫. বই সাথে থাকলে কোথাও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়টাকেও অপচয় থেকে বাঁচানো যায়।

পার্থিব অন্যান্য জ্ঞানের কোনো শরয়ী মর্যাদা আছে কি?

কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান ওহীর ইল্‌ম নয় বটে, কিন্তু এ সবের কোনো মর্যাদা ইসলামী দৃষ্টিতে আছে কিনা? এসব বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা তো স্বীকার করতেই হবে, তবে এসব বিদ্যা অর্জন করাটা কি নিছক দুনিয়াদারি ব্যাপার? এসবের কি কোনো শরয়ী মর্যাদা আছে?

একটি হাদীস থেকে এ বিষয়ে আমরা এর সঠিক জওয়াব জানতে পারি।

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ .

'অন্য সব ফরযের পর হালাল রুজী তালাশ করাও ফরয।'

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, হালাল উপায়ে রোজগারের চেষ্টা করা ফরয। তাহলে আয়-রোজগারের উদ্দেশ্যে কোনো না কোনো পেশা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। যে পেশাই গ্রহণ করা হোক এর জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যা অর্জন করতেই হবে।

ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করলে তাকে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করতেই হবে। চিকিৎসা করে রোগীদের নিকট থেকে টাকা নিয়েই যারা রুজী যোগাড় করে তারা যদি চিকিৎসা বিদ্যা ভালোভাবে আয়ত্ত না করে, যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন সে বিষয়েও প্রেসক্রিপশন লিখে রোগীর সাথে প্রতারণা করে তাহলে তার আয় হালাল হবে না। তাই তার আয় হালাল করার প্রয়োজনেই তাকে ঐ বিদ্যা যথাযথভাবে অর্জন করতে হবে। ডাক্তারি বিদ্যা না শিখেই হাতুড়ে চিকিৎসকরা যে আয় করে তা কি হালাল হতে পারে?

তাহলে একথা প্রমাণিত হলো যে, হালাল রোজগারের চেষ্টা করা ফরয এবং রুজী হালাল করার প্রয়োজনে পেশাগত বিদ্যা যথাযথ শিক্ষা করা জরুরী। সুতরাং পার্থিব সব বিদ্যা অর্জন করা সরাসরি ফরয নয় বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাও ফরযের মর্যাদার অধিকারী।

www.amarboi.org

যিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তার রুজীকে হালাল করতে হলে তাকে তার বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে তাকে পাঠ-দানের বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হবে। যে শিক্ষকের ক্লাসে ছাত্ররা পাঠদানে সন্তুষ্ট নয় তার বেতন হালাল হবে কি? যে শিক্ষক যোগ্যতার সাথে পড়ান ছাত্ররা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। ছাত্রদের মন্তব্য থেকেই জানা যায় যে, কে ভালো শিক্ষক, আর কে ভালো নয়। এভাবেই আমরা পেশাগত বিদ্যার শরয়ী মূল্যায়ন করতে পারি।

শখের বিদ্যার মর্যাদা কী?

পেশার অতিরিক্ত কোনো বিদ্যা শখ করে কেউ কেউ শিখে থাকে। যেমন হস্তরেখা বিদ্যা, জোতির্বিদ্যা, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যা, যাদু বিদ্যা, গার্ডেনিং ইত্যাদি। মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর যে কোনো বিদ্যাই শিক্ষা করা যেতে পারে। পেশাগত বিদ্যা তো রুজী-রোজগারের জন্য শিখতেই হয়। কেউ সৌখিন হয়ে অন্য কোনো বিদ্যা শিখলে শরীআতে কোনো আপত্তি আছে কি না?

এ বিষয়ে নীতিগত কথা হলো, যে পেশা গ্রহণ করা হালাল নয় সে পেশাগত বিদ্যা অর্জন করাও জায়েয নয়। হস্তরেখা বিদ্যা শিখে তা পেশা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ দ্বারা মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না; বরং হস্তরেখা দেখে কারো কিসমত বা আয়ু সম্পর্কে মতামত দেওয়া প্রতারণা মাত্র। এটা কোনো নিশ্চিত বিষয় নয়। এ মতামত দ্বারা কারো কল্যাণ হবার কারণ নেই।

এ বিষয়ে বিস্তর মত পার্থক্যের সুযোগ আছে। মানুষের রুচি বিচিত্র। তাই এসব নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। যাদুকরের শিল্প বা হাতের সাফাই মানুষকে নির্মল আনন্দ দান করে। এর মধ্যে অশ্লীলতা না থাকারই কথা। বিনোদন হিসেবে তা দেখা যায়। কিন্তু এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হালাল কিনা তা চিন্তা ভাবনার বিষয়।

জীবের চিত্র অঙ্কনের বিরুদ্ধে হাদীসে খুব কঠোর মন্তব্য আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্গন, ক্যালিগ্রাফী ইত্যাদিতে শরীআতের কোনো আপত্তি নেই। তাই এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায়ও দোষ নেই।

মুমিন আখিরাতের সাফল্যকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করে। তাই সাবধানেই তাকে পেশা বাছাই করতে হয়। সে হিসাব কষেই শখের বিদ্যা সম্পর্কেও তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

www.amarboi.org

নেক আমল

আমল মানে কী?

আরবী عَمَلٌ (আমল) শব্দের বাংলা অনুবাদ হলো কর্ম বা কাজ। কাজের সূচনা হয় চিন্তা থেকে। মানুষ যখন কোনো কাজ করতে চায় তখন বুঝা যায়, সে ঐ কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করছে। চিন্তার সাথে সাথেই কাজ শুরু হয়ে যায় না। যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ কাজের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে তখন কাজটি শুরু করা হয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ ইচ্ছা ও চেষ্টার সমন্বয়েই কাজ শুরু হয়। ইচ্ছা করাকে আরবীতে নিয়ত বলা হয়। এর অর্থ হলো কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সিদ্ধান্ত না হলে তো চেষ্টা শুরু হতে পারে না। কিন্তু শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই কাজটি শুরু হয় না। ইচ্ছা, নিয়ত বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেষ্টা করলে কাজটি শুরু হয়েছে বলে বুঝা গেল।

নেক বলতে কী বুঝায়?

নেক শব্দটি ফার্সি ভাষার। এ উপমহাদেশে দীর্ঘ ৬ শতাব্দীর মুসলিম শাসনামলে ফার্সিই রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় ছিল। তাই বাংলা ভাষায় অগণিত ফার্সি শব্দ চালু হয়ে আছে। ইসলামের অনেক মৌলিক পরিভাষাও আরবীর বদলে ফার্সি পরিভাষায় চালু হয়েছে। আরবী সালাত ও সাওম নামায ও রোযা পরিভাষায় প্রচলিত। এমনকি স্বয়ং আল্লাহও খোদা হিসেবে এদেশে পরিচিত হয়েছেন। খোদা মানে খোদ-আ। অর্থাৎ যিনি নিজেই অস্তিত্বে এসেছেন। সূরা ইখলাসের 'লাম ইউলাদ' শব্দটির মানেই খোদা। অর্থাৎ তাকে কেউ পয়দা করেনি। তিনি স্বয়ং অস্তিত্ববান।

কুরআনের যে শব্দটি হলো صَالِحٌ (সালেহ)। এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যেমন– ভালো, সৎ, যোগ্য, উপযুক্ত, যথাযথ, ভালো কাজ, পুণ্য ইত্যাদি। কুরআনে বহু আয়াতে বেহেশতের সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা ঈমান এনেছে ও সালেহ আমল করেছে তারাই জান্নাতবাসী হবে। শুধু ঈমান আনলেই চলবে না, নেক আমলও করতে হবে, যদি বেহেশতে কেউ যেতে চায়। নেক আমলের অভাব হলে ঈমান থাকা সত্ত্বেও প্রথমে দোযখেই যেতে হবে। অবশ্য শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে ঈমানদার ব্যক্তি এক সময়ে বেহেশতে যেতে পারবে। কিন্তু সালেহ আমল ছাড়া শুধু ঈমানের কারণে কেউ প্রথমে বেহেশতে যেতে পারবে না।

www.amarboi.org

কুরআনের পরিভাষায় ভালো ও মন্দ কাজ

কুরআনের বহু আয়াতে এবং অগণিত হাদীসে اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ কথাটি পাওয়া যায়। এর অর্থ করা হয়– 'ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা'। এখানে ভালো অর্থে যে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে তা আরবীতে 'মা'রূফ' এবং মন্দ অর্থে 'মুনকার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ দুটো শব্দের আভিধানিক অর্থ পসম্পর ভিন্ন।

مَعْرُوْفٌ শব্দটির অর্থ হলো পরিচিত। অথচ এ শব্দটি 'ভালো কাজ' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর مُنْكَرٌ শব্দের মানে হলো যা প্রত্যাখ্যাত, অস্বীকৃত, পরিত্যাজ্য। অথচ এ শব্দটি 'মন্দ কাজ' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এর তাৎপর্য বুঝতে হবে।

আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের মধ্যেই নৈতিক চেতনা দান করেছেন। তাই সে কোন্‌টা ভালো, আর কোন্‌টা মন্দ তা বোঝে। এ চেতনাকেই আমরা বিবেক বলে থাকি। নাফসের তাড়নায় ও শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ মন্দ কাজ করে বটে, কিন্তু তার বিবেক জানে যে, কাজটি মন্দ। এমন কোনো অপরাধী নেই, যে অপরাধ করে কিন্তু সে বুঝে না যে, এটা অপরাধ। বিবেককে ফাঁকি দেবার সাধ্য কারো নেই।

এই বিবেকের নিকট যা যা ভালো তা পরিচিত। সে ভালো করেই চেনে কোন্‌টা ভালো। তাই কুরআনে ভালো কাজ বুঝাবার জন্য মারূফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার এ শব্দ চয়ন কতই না চমৎকার! আল্লাহ বলতে চান যে, হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি যা কিছু করতে হুকুম করেছি, তা যে ভালো তা তো তোমাদের অবশ্যই জানা আছে। নাফসের গোলামি কবুল করলে আলাদা কথা। তা-না হলে আমার হুকুম তোমাদের জন্য যে কল্যাণকর তা তোমাদের অজানা নয়।

যা মন্দ তা মানুষের বিবেকের নিকট পরিত্যাজ্য। মনুষ্যত্ববোধ কোনো মন্দকে ভালো বলে স্বীকার করে না। তাই আল্লাহ তাআলা মন্দ কাজের অর্থে 'মুনকার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বলতে চান যে, তোমার বিবেক যা ভালো বলে স্বীকার করে না তাই মন্দ এবং আমি মন্দ কাজ করতেই নিষেধ করেছি। আমার নিষেধাজ্ঞা তোমার বিবেকের নিকট সঠিক।

নাফস, রূহ ও কালবের ফাংশন বা কর্মতৎপরতা

নাফস মানে দেহের যাবতীয় দাবি। খিদে লাগলে খেতে চায়, গরম বোধ করলে ঠাণ্ডা চায়, সুন্দর কিছু পেলে দেখতে চায়, ভোগের উপকরণ পেলে ভোগ করতে

www.amarboi.org

চায়। দেহের কোনো নৈতিক চেতনা নেই বলে সে যা চায় তা নৈতিক দিক দিয়ে মন্দ হতেই পারে। তাই মানুষ যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখনি সে কাজটি নৈতিক দিক দিয়ে আপত্তিকর হলে রূহ আপত্তি জানায়। তখন নাফস ও রূহের মধ্যে লড়াই চলে। সব মানুষেরই এ তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্র 'রোহিনী' উপন্যাসে এ লড়াই-এর দুপক্ষের সুন্দর নাম দিয়েছেন– সুমতি ও কুমতি। সুমতি বলে যে, এটা করা ঠিক নয়। কুমতি বলে, এমন মজা কি ত্যাগ করা যায়?

রূহ ও নাফসের এ লড়াইতে যার জয় হয় তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কর্ম সম্পাদন করা হয়। এ কর্ম সম্পাদনী শক্তিই হচ্ছে কালব। কালব শব্দের অর্থ পরিবর্তনশীল। এক সময় সে রূহের আনুগত্য করে, আর এক সময় নাফসের। সে এক অবস্থায় থাকতে পারে না বলেই এর নাম কালব।

একটা সহজ উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হতে পারে। রাষ্ট্রে যে সরকার থাকে এর তিনটা বিভাগ আছে– আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ- Legislature, Judiciary and Executive. আইন বিভাগ সিদ্ধান্ত দেয় যে, এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। এটাই নাফসের ফাংশন। বিচার বিভাগ ঐ আইনটি শাসনতন্ত্রের নীতির বিরোধী হলে আপত্তি জানায়। এটা হলো রূহের ফাংশন। এ বিরোধ নিয়ে দ্বন্দ্ব চলার পর এক পর্যায়ে হয় সরকার বিচার বিভাগের কথা মেনে নেয়, অথবা বিচার বিভাগ তার আপত্তি তুলে নেয়। তখন যার কথা টিকল তাই শাসন বিভাগ কার্যকর করে। এটাই কালবের ফাংশন।

কর্ম সম্পাদনের কোনো ক্ষমতা বা ইখতিয়ার মানুষের নেই

মানুষকে আল্লাহ তাআলা কোন কাজের জন্য ইচ্ছা করা ও চেষ্টা করার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজটি সমাধা বা সম্পন্ন করার কোনো ইখতিয়ারই দেননি। কাজটি ভালো হোক, আর মন্দ হোক তা সম্পন্ন করাবার ইখতিয়ার সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। মানুষ ইচ্ছা করেছে বলেই কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাবে না, যদি আল্লাহর ইচ্ছা শরীক না হয়। তিনি চাইলেই শুধু কাজটি সমাধা হবে। তিনি না চাইলে যত চেষ্টাই করা হোক কাজটি সম্পন্ন হবে না।

যেহেতু কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা মানুষের হাতে নয়, সেহেতু ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তির জন্য কর্মটি সমাধা হওয়া শর্ত নয়। কেউ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে কাজটি সমাধা না হলেও সে কাজটি সমাধা করেছে বলে গণ্য করে পুরস্কার দেওয়া যাবে। কারণ তার ইখতিয়ারে যা ছিল তা সে করেছে। যা তার ক্ষমতার বাইরে এর জন্য তার পুরস্কার আটকে থাকবে কেন?

www.amarboi.org

যেমন এক ব্যক্তি হজ্জে যাবার ইচ্ছা করল এবং রওয়ানা হয়ে গেল। ইচ্ছা ও চেষ্টার দায়িত্ব সে পালন করল; কিন্তু পথে সে মারা গেল। সে হজ্জ সমাধা করেছে বলে গণ্য করা হবে। কারণ যদি হাশরের ময়দানে তাকে চার্জ করা হয় যে, তুমি হজ্জ করলে না কেন? তাহলে সে বলবে, আমি তো হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে কেন? তাই আল্লাহ তাকে চার্জই করবেন না। হজ্জ করার পুরস্কার তাকে দিয়ে দেবেন।

মন্দ কাজের উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে খুন করার ইচ্ছা করল এবং সে উদ্দেশ্যে শাবল মাথার উপর উঁচিয়ে মারতে উদ্যত হলো। দু'জন লোক দৌড়ে এসে শাবল ধরে বিরত করল। আদালতে মামলায় প্রমাণ হলো যে, সে খুন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করেছে। আইনের ভাষায় Intentionally attempted to commit murder. আমাদের দেশের আইনে এ জাতীয় অপরাধীর শাস্তি কমপক্ষে তিন বছরের জেল। অথচ অপরাধী যাকে খুন করতে চেয়েছিল তাকে একটু চিমটিও কাটেনি। তাহলে শাস্তি কেন? প্রমাণিত হলো যে, শাস্তি কর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভর করে না। ইচ্ছা ও চেষ্টা সম্পন্ন হলেই কর্ম সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ এক ব্যক্তি পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে গাছে গুলি চালাল। সেখানে এক লোক ছিল। কিন্তু শিকারি জানতো না। ঐ লোকের গায়ে গুলি লাগল এবং লোকটি মারা গেল। খুনের কর্ম সম্পাদন হলো বটে, কিন্তু এর জন্য বন্দুকের মালিক ইচ্ছাও করেনি, চেষ্টাও করেনি। তাই আদালতে এ কথা প্রমাণ হলে তার কোনো শাস্তিই হবে না। অথচ খুনের কর্মটি কিন্তু হয়েই গেল।

দুনিয়ায় যেমন, আখিরাতেও তেমনি পুরস্কার ও শাস্তি ইচ্ছা ও চেষ্টার ফল, কর্মের বদলা নয়।

এ কথা বুঝে আসলে তাকদীরও আর রহস্য থাকে না। মানুষ যা করতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে তা সম্পন্ন হবে যদি আল্লাহ তার তাকদীরে রেখে থাকেন। আর নেক আমল সম্পন্ন হওয়া তাকদীরে না থাকলেও এর পুরস্কার অবশ্যই পাবে। তেমনি তার মন্দ কাজ সমাধা না হলেও সে শাস্তি পাবেই। তাই তাকদীরের কোনো দোষ নেই। কাজের বদলা (ভালো বা মন্দ) তাকদীরের উপর নির্ভর করে না। আল্লাহর এ নিয়মে কোনো অবিচার নেই। প্রত্যেকেই তার নিয়ত ও চেষ্টা অনুযায়ী বদলা পাবে। তাই তাকদীরে যাই থাকুক তাতে তার লাভও নেই, ক্ষতিও নেই। তাকদীর নিয়ে পেরেশান হবার কোনো প্রয়োজনই নেই। তবে তাকদীরে বিশ্বাস করা জরুরী। এ বিশ্বাস মানে, আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন তাই হবে। কারো চেষ্টায় তাকদীর বদলে যাবে না।

www.amarboi.org

সহীহ নিয়ত ছাড়া পুরস্কার পাওয়া যাবে না

রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়ত হিসেবেই বিবেচ্য'।

কাজটি বাহ্যত খুব ভালো হলেও কী নিয়তে কাজটি করা হলো সে বিষয়টি বিবেচনা করেই আল্লাহ তাআলা ঐ কাজটি মূল্যায়ন করবেন। যদি কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের নিয়তে করা হয় তবে তা তিনি কবুল করবেন। আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাওয়ার নিয়ত ছাড়া যদি কেউ দুনিয়ায় মানুষ 'বীর' ও 'বাহাদুর' বলবে আশা করে জিহাদের ময়দানে শহীদও হয় তবু সে দোযখেই যাবে বলে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন। হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজটি যত নেকই হোক তা 'ঈমান ও ইহতিসাবের' সাথে করলেই পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবে। কাজটি ঈমানের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে ও এর বদলায় সওয়াব পাওয়ার নিয়তে করতে হবে।

সাধারণত মানুষ সুনামের উদ্দেশ্যে জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে 'রিয়া' বা লোক দেখানো কাজ বলা হয়। জনগণ 'দানশীল' হিসেবে সম্মান করবে বা নেতা বানাবে এ আশায় দান করা হয়। যে নিয়তে সে করেছে তা দুনিয়াতেই সে পেয়ে যায়। সে আখিরাতে কেন পুরস্কার পাবে? সে উদ্দেশ্যে তো সে তা করেনি। তাই নিয়তের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চেষ্টা না করা পর্যন্ত শুধু ইচ্ছা করার কোনো ফল আছে কি?

কেউ কোনো একটি ভালো বা মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করলো, কিন্তু ঐ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজটি করার চেষ্টা করার সুযোগ পেল না। এ রকম ইচ্ছা করার কোনো ফল আছে কি না?

বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা বড়ই মেহেরবান। সহীহ বুখারী থেকে জানা যায়, যদি কেউ কোনো নেক কাজের নিয়ত করে আর তা কাজে পরিণত করার সুযোগ না পায় তবুও তাকে একটি পূর্ণ সওয়াব দেওয়া হবে। আর যদি কেউ কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর তা কাজে পরিণত না করে, তবে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার হিসেবে একটি নেক কাজের পূর্ণ সওয়াব পাবে।

মৃত্যুর পরও কি আমল জারী থাকে?

রাসূল (স) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন ঃ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ .

www.amarboi.org

'যখন কেউ মারা যায় তখন তার আমল করা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি জিনিস (বাকি থেকে যায়) (১) সদকায়ে জারিয়া (যে দান চালু থাকে), (২) এমন বিদ্যা যা থেকে উপকার পাওয়া যায় এবং (৩) এমন নেক সন্তান যে (পিতা-মাতার জন্য) দোআ করতে থাকে।'

এ হাদীসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ যে কাজ করে যদি তার জের চলতে থাকে তাহলে যতদিন জের চলবে ততদিন সে কাজ করছে বলে গণ্য হবে। যেমন–

১. জনগণের সুবিধার জন্য সওয়াবের নিয়তে কেউ যদি একটা রাস্তা তৈরি করে দেয় তাহলে যতদিন রাস্তাটি টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এর সওয়াব তার আমলনামায় জমা হতে থাকবে।

২. কেউ যদি তার সন্তানকে আল্লাহর নেক বান্দাহ হিসেবে গড়ে তোলে তাহলে ঐ সন্তান আজীবন যত নেক আমল করবে এর সওয়াব সমপরিমাণে তার আমলনামায় জমা হবে। তার সন্তানও যদি তারই মতো তার সন্তানকে গড়ে তোলে তাহলে এর সওয়াবও তাদের আমলনামায় জমা হতে থাকবে।

৩. কেউ যদি সওয়াবের নিয়তে মানুষকে এমন কোনো বিদ্যা শিক্ষা দেয়, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর, তাহলে যতদিন ঐ কল্যাণ চালু থাকবে ততদিন তার আমলনামায় সওয়াব জমা হতে থাকবে।

মন্দ কাজের বেলায়ও গুনাহ জারি থাকবে। যেমন–

১. কেউ যদি ডাকাতি করে এবং অন্য কাউকে ডাকাতি শিক্ষা দেয় তাহলে তার মৃত্যুর পর তার শাগরিদের গুনাহও উস্তাদের আমলনামায় জমা হবে।

২. কেউ যদি কাউকে কোনো মন্দ কাজে সাহায্য করে বা উৎসাহিত করে তাহলে সে নিজে মন্দ কাজ না করলেও ঐ মন্দ কাজের গুনাহ তার আমলনামায় শামিল করা হবে।

৩. কেউ যদি কোনো কুপ্রথা বা নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ সমাজে চালু করে, তাহলে তার মৃত্যুর পরও যতদিন তা সমাজে চালু থাকবে ততদিন এর গুনাহ তার আমলনামায় জমা হতে থাকবে।

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, কারো মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমলের একাউন্ট (হিসাবের খাতা) বন্ধ হয়ে যায় না। কোনো কোনো ভালো ও মন্দ কাজের জের কিয়ামত পর্যন্তও জারি থাকতে পারে। তাই দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার পরই আমলের খাতা লেখা বন্ধ হবে।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন আমলনামা হাতে পাবে তখন তার কাজের দীর্ঘ হিসাব দেখে চিৎকার করে বলে উঠবে, 'হে আল্লাহ! আমি তো এত কিছু

www.amarboi.org

করিনি। এতগুলো আমার হিসাবে কেমন করে এলো?' একথা শুধু বদ লোকেরাই বলবে না, নেক লোকেরাও বলবে। উভয় প্রকার লোককে একই জওয়াব দেওয়া হবে– এটা ঠিক যে তুমি নিজে এত কিছু করনি; কিন্তু তুমি অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছ, অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়েছ, তোমাকে দেখে তারা শিখেছে বা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাই অন্যদের আমলও তোমার হিসাবে ধরা হয়েছে। সূরা ইনফিতারের ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ.

'(কিয়ামতের পর) প্রত্যেক মানুষ জানতে পারবে যে, সে আগে কী (আমল) পাঠিয়েছে এবং পরে সে কী করেছে'। এখানে আগে করেছে মানে জীবিতকালে করেছে, আর পরে করেছে মানে মৃত্যুর পরে করা হয়েছে বলে ধরা হয়েছে।

তাই দুনিয়ায় অতি সতর্কতার সাথে আখিরাতের হিসাবের কথা খেয়ালে রেখে আমল করতে হবে।

আমল সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা

আমল মানে কাজ। কিন্তু কোনো কিছু হাসিল করার জন্য কোনো দু'আ পড়াকেও সাধারণত আমল বলা হয়। মাওলানা মওদূদী (র)-কে খুলনায় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুযুর! আমার আয়ের কোন পথ নেই। বেকার অবস্থায় আছি। এক হুযুর আমাকে এ দোআটি সোয়া লাখ বার পড়তে বলেছেন। এটা নাকি রিযিক হাসিলের আমল।'

মাওলানা তাকে বললেন, 'আপনি এ দোআটি বসে বসে পড়লে রিযিকের আমল হবে না। আপনি আয়ের জন্য চেষ্টা করতে থাকবেন এবং এ দোআটি পড়তে থাকবেন। সোয়া লাখবার হলো কিনা সে হিসাবের দরকার নেই। যতদিন পর্যন্ত আয়ের উপায় না হয় ততদিন পড়তে থাকবেন এবং আয়ের পথ তালাশ করতে থাকবেন।'

লোকটি চলে গেলে মাওলানা মন্তব্য করলেন, 'যে জাতি আমল না করাকে আমল মনে করে সে জাতির কেমন করে উন্নতি হবে?'

হাদীসে আছে, যখন কেউ মারা যায় তখন তার লাশের সাথে তিনটি জিনিস কবর পর্যন্ত যায়। (১) আত্মীয় স্বজন (২) কিছু মাল (৩) তার আমল। দাফনের পর দুটো জিনিস ফিরে আসে, আর শুধু একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। সে জিনিসটি হলো তার আমল।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড